বাংলাদেশে বাংলা ও অন্যান্য লিপির ব্যবহার-বৈচিত্র্য

মো. সাইফুল ইসলাম

বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ
ডিসেম্বর-২০০৪

RR
B
491.441109
ISP
C-2

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বাংলা ও অন্যান্য লিপির ব্যবহার-বৈচিত্র্য

মো. সাইফুল ইসলাম

402425

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা, বাংলাদেশ।
ডিসেম্বর-২০০৪।

Dhaka University Library
402425

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম.ফিল. গবেষক মোঃ সাইফুল ইসলাম কর্তৃক সম্পন্নকৃত "বাংলাদেশে বাংলা ও অন্যান্য লিপির ব্যবহার-বৈচিত্র্য" শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে । এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এ অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোনো অংশ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রীর জন্য জমা দেওয়া হয়নি।

তত্ত্বাবধায়ক ঃ

২.১২.০৪

(ড. এস.এম. লুৎফর রহমান)
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

তারিখ : ২রা ডিসেম্বর, ২০০৪
ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

০৬

বাংলাদেশে বাংলা ও অন্যান্য লিপির ব্যবহার-বৈচিত্র্য

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম. ফিল. ডিগ্রির জন্যে দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ)

402425

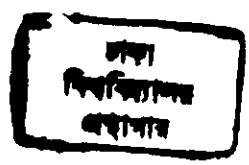

তত্ত্বাবধায়ক
ডক্টর এস. এম. লুৎফর রহ্‌মান
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০।

গবেষক
মো. সাইফুল ইসলাম
রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ- ১২, শিক্ষাবর্ষঃ- ১৯৯৭-৯৮।
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলা দেশ অতি প্রাচীন। বিভিন্ন গবেষক এ সম্পর্কে তাদের মতামত যুক্তিসহ উপস্থাপন করেছেন। প্রত্ন- প্রস্তর যুগ , নব্য প্রস্তর যুগ ও তাম্রযুগের বিভিন্ন নিদর্শন বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন অংশে পাওয়া গেছে। এমনকি বাংলা লিপি সম্পর্কে চলছে নানা গবেষণা। বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অভিমতে মোট ১৫ জন লিপিতত্ত্ববিদ ও গবেষকের মতামত আলোচিত হয়েছে। তাঁদের অভিমত আলোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, বাংলা দেশের মত বাংলা লিপিও প্রাচীনতর। এই ভূখণ্ডের আদিম অধিবাসী যোগতান্ত্রিকরাই প্রথমে বাংলা লিপির উদ্ভাবন করেন। তারপর ধীরে ধীরে বাংলা লিপির ক্রমবিকাশ হয়। অনেক গবেষক বলেছেন , লিপির চেহারা দেখেই লিপির কাল নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ লিপির রূপ যত আধুনিক লিপিকালও সেই সময়ের। কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলা লিপির ক্ষেত্রে এ মন্তব্য ভুল প্রমাণিত হয়েছে । অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে , খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের লিপিমালার চেয়ে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে অনুলিখিত একটি পুথির লিপিমালা দু'একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত প্রায় হুবহু আধুনিক বাংলা লিপির মতো ।

402425

এ অভিসন্দর্ভে ঐতিহাসিক যুগ অর্থাৎ নবম শতক থেকে শুরু করে ১৫ শতক পর্যন্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন শিলালেখে প্রাপ্ত বাংলা লিপির নমুনা ও ভারতীয় বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত বাংলালিপির নমুনা উপস্থাপন করে, সে সম্পর্কে গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্মোহ আলোচনা করা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভে যে সকল শিলালেখের বিবরণ আলোচিত হয়েছে সেগুলো হলো:

ক) নারায়ণ পালের বাদাল স্তম্ভ; খ) বিজয়সেনের দেওপাড়া লেখ; গ) লক্ষ্মণসেনের তর্পণ দীঘীর দানপত্র; ঘ) কামরূপের বৈদ্যদেবের দানপত্র; ঙ) আসামে প্রাপ্ত বল্লভেন্দ্রের দানপত্র; চ) হস্ত্রাকোলে প্রাপ্ত লেখ এবং উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তমদেবের দানপত্র; ছ) মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে রাধা অঞ্চলে কালো পাথরের স্তম্ভমূলে প্রাপ্ত শিলালিপি; জ) ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত শিলালেখ; ঝ) ঢাকার ডাল বাজারে প্রাপ্ত শিলালেখ;ঞ) মাহমুদ শাহের সময়ে দিনাজপুরে একটি সেতুর পাদদেশে প্রাপ্ত শিলালেখ।

উপর্যুক্ত শিলালেখসমূহের আলোচনা শেষে প্রাচীন বাংলার লিপির ব্যবহার-বৈচিত্র্যের পাশাপাশি ইতিহাস-ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক যুগে বাংলাদেশে বাংলা লিপির ব্যবহার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এ অভিসন্দর্ভে বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন বলে পরিচিত 'চর্যাপদ' এর লিপি বিচার এবং বৈচিত্র্য নির্দেশ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৪০১ থেকে ১৮০১ সালের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির আলোচনা ও ব্যবহার- বৈচিত্র্য নির্দেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল পুথির লিপি আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো:

ক) বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ;
খ) সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি থেকে লিখিত লিপির চিত্র;
গ) 'নবীবংশ' পুথির পাণ্ডুলিপি;
ঘ) পদ্মাবতী পুথির পাণ্ডুলিপি;
ঙ) আদ্য-পরিচয় পুথির পাণ্ডুলিপি।

উপর্যুক্ত পুথির লিপির ব্যবহার-বৈচিত্র্য সম্পর্কে গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে।

402425

মুসলিম আমলে মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লিপিতত্ত্ববিদ ও গবেষকগণ আরবী লিপির সঙ্গে সমীকরণ করে মাত্র ১৮ টি বাংলা হরফে বাংলা লেখার প্রচলন করেন। এ কাজে তাঁরা বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেন । ১৮হরফে বাংলা লেখার কর্মপ্রয়াস কীভাবে সম্ভব হলো তা এই অভিসন্দর্ভে আলোচিত হয়েছে। পুথি সাহিত্যের প্রসারের সাথে সাথে অনেক মুসলিম গবেষক ও বিদ্বান ব্যক্তি আরবী লিপির সাহায্যে বাংলা পুথি লিখতে শুরু করেন। এ কাজে তাদের সাফল্য লক্ষ্য করার মতো। এ অভিসন্দর্ভে এমন কয়েকটি পুথির রচনা উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাংলা ভাষায় রচিত হলেও আরবী লিপিতে প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া অনুশাসন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে মুসলিম আমলে ভাওয়াল লিপি,সিলেটী লিপি,আরবী-ফারসী ও নাগরী লিপির প্রচলন ছিল এবং এসব লিপির সাহায্যে কিছু কিছু বাংলা গ্রন্থও রচিত হয়েছে।

ভাওয়াল লিপি আধুনিক বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের চণ্ডাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত হতো। সিলেটী নাগরী লিপিতেও যে এক সময় উন্নত সাহিত্য চর্চার প্রসার ঘটেছিল; তার বিবরণও এ অভিসন্দর্ভে প্রদত্ত হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

◀◀ সূচিপত্র ▶▶

প্রথম অধ্যায়ঃ-

- ☞ বাংলাদেশ ও বাংলা লিপির প্রাচীনত্ব।
- ☞ লিপিতত্ত্ববিদদের বিভিন্ন মত।
- ☞ বাংলা লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে সাম্প্রতিক অভিমত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ-

- ☞ চর্যাপদের লিপি বিচার ও বৈচিত্র্য নির্দেশ।
- ☞ ঐতিহাসিক যুগের শিলালেখে বাংলা লিপির ব্যবহার ও বৈচিত্র্য
- ☞ ঐতিহাসিক যুগে বাংলা পাণ্ডুলিপিতে বাংলালিপির ব্যবহার-বৈচিত্র্য (১৪০১-১৮০১)।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ-

- ☞ মুসলিম শাসন আমলে বাংলা ও অন্যান্য লিপির ব্যবহার।
- ☞ বাংলা গ্রন্থ রচনায় আরবী লিপির ব্যবহার।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ-

- ☞ বাংলাদেশে ভাওয়াল লিপির পরিচয়।
- ☞ সিলেটী লিপির উদ্ভব ও ক্রম বিকাশ।
- ☞ সিলেটী লিপি সম্পর্কে বিভিন্ন মত।
- ☞ সিলেটী লিপির ব্যবহার-বৈচিত্র্য।
- ☞ বাংলা গ্রন্থ রচনায় সিলেটী নাগরী লিপির ব্যবহার।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ-

- ☞ উপসংহারঃ (সংক্ষেপে মূল বক্তব্য ও কিছু সংখ্যক লিপিচিত্র)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

- বাংলাদেশ ও বাংলা লিপির প্রাচীনত্ব।
- লিপিতত্ত্ববিদ্‌দের বিভিন্ন মত।
- বাংলা লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে সাম্প্রতিক অভিমত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রাচীনত্ব

বাংলা দেশ অতি প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এদেশে মানব জাতির বসবাস ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এদেশে সর্বপ্রথম কখন মানব জাতির বসবাসের সূচনা হয়, সে কথা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও, মানব সভ্যতার বিকাশের ধারা বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতি অতীত সম্পর্কে তথ্যোদ্ঘাটনে সমর্থ।

বিশ্ব মানব সভ্যতার বিকাশের ক্রমধারায় বাংলা দেশের মানব সভ্যতারও বিকাশ ও বিস্তৃতি। উক্ত ধারায় প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসকে প্রস্তর যুগ, তাম্রযুগ ও লৌহ যুগে বিভক্ত করা হয়।
বাংলাদেশের জনমানুষের প্রত্ন, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের যেটুকু সন্ধান লাভ করা যায়, তা থেকে এদেশের অতীতকালের মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ধারার পরিচয় মেলে।

কারণ অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশেও প্রত্নযুগের যে সব উপকরণ পাওয়া গিয়েছে, সে বিষয়ে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "এখানেও প্রত্ন ও নব্যপ্রস্তর এবং তাম্রযুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বভাগ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে পলিমাটিতে গঠিত হইয়াছিল। বাংলার অন্যান্য প্রদেশেই সম্ভবত প্রস্তর ও তাম্রযুগের মনুষ্যের বসতি সীমাবদ্ধ ছিল"। [১]

তাঁর এই উক্তি অমূলক নয়। কারণ ভারতীয় বাংলার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক ১৯৬২-৬৩ সালে (পশ্চিমবঙ্গের) বীরভূম ও বর্ধমান জেলার অজয়, কুনুর, ও কোপাই নদীর তীরে যে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য পরিচালিত হয় ; তা থেকে ফলে ঐসব অঞ্চলে তাম্র প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়।

এ সম্পর্কে ড. আব্দুর রহিম ও সহলেখকগণ বলেছেন, "বর্ধমান জেলার অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে, খৃষ্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এক উন্নতমানের সভ্যতার নিদর্শন উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আবিষ্কৃত নিদর্শন সমূহ হইতে অনুমান করা হয় যে, এই সভ্যতার স্রষ্টারা ধান চাষ করিত, সম্বর, নীলগাই প্রভৃতি পশু শিকার ও শূকর প্রভৃতি পশু পালন করিত, নানা রকমের চিত্র শোভিত মৃৎপাত্র ব্যবহার করিত, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রস্তর ও তাম্রের ব্যবহার করিত এবং ধীরে ধীরে লৌহের সহিত তাহাদের পরিচয় ঘটিয়াছে"। [২]

১.রমেশচন্দ্র মজুমদার। বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড),প্রাচীন যুগ (৬ষ্ঠ সংস্করণ, জেনারেল প্রকাশনী, কলকাতা-১৯৬১)পৃ.১০।
২. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য। বাংলাদেশের ইতিহাস, (১ম সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা -১৯৭৭) পৃ.৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ যে প্রাচীন, এ কথার আরো প্রমাণ পাওয়া যায় পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে স্টীটাইট (Steatite) পাথরের একটি গোলাকার সীলের রহস্য উদ্ঘাটনের মাধ্যমে। সীলটিতে কতকগুলো চিহ্ন খোদিত, যা চিত্রাক্ষর (Pictograph)। গবেষণায় জানা গিয়েছে এই সীলটি ভূমধ্যসাগরীয় ক্রীটদ্বীপের, যা প্রায় তিন হাজার বছরের পুরনো।

এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুর রহিম ও সহলেখকগণ বলেন, "পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ হইতে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রায় তিন হাজার বছর আগে যখন ভারতবর্ষের পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে উন্নতমানের সভ্যতার অধিকারী মানব জাতির বাস ছিল, সেই সময়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলও উন্নতমানের সভ্যতার দাবী করতে পারে"।[৩]

সম্রাট অশোকের সময়ে প্রাপ্ত শিলালিপির আবিষ্কার এবং শিলালিপিতে মুদ্রা ও খাদ্যশস্যের উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশ প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। এ সম্পর্কে রামশরণ শর্মা বলেন, " উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু অংশে (যা বর্তমান বগুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত) সম্রাট অশোকের রাজত্বকালেই লিপির প্রচলন ছিল প্রমাণিত হয়েছে। একটি লিপিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য বেশ কিছু আবাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবাসনগুলিতে মুদ্রা ও খাদ্যশস্যের এক মজুত ভাণ্ডারের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। উৎপাদনের একাংশ রাজাকে কর এবং উপহার হিসাবে দেওয়ার সামর্থ্য তখন কৃষকদের ছিল। বঙ্গভূমির অধিবাসিরা প্রাকৃত ভাষা জানতেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল"।[৪]

বাংলাদেশ অতি প্রাচীন এ সম্পর্কে যতীন্দ্র মোহন রায় তাঁর 'ঢাকার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "বস্তুত বাঙ্গলা দেশ নূতন নহে; বাঙ্গলার নদীবাহুল্যও নূতন নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই নদীবহুল বাঙ্গলা বর্তমান রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেক স্থানের অবস্থা বারংবার পরিবর্তিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এখন যেখানে নিবিড় অরণ্য, পূর্বে কোন এক সময়ে তথায় মহাসমৃদ্ধ নগর ছিল; তাহার প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুন্দরবনের স্থানে স্থানেও তদ্রূপ প্রাচীন পুরীর ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য অনুমান হয় যে, ঐ সকল স্থানেও পূর্বে জনপদ ছিল; পরে মগ ও পর্তুগীজগণের ভীষণ অত্যাচারের ফলে ঐ স্থানের অধিবাসীগণ স্থানান্তরিত হওয়ায়, উহা অরণ্যানিসংকুল হইয়া পড়িয়াছে।" [৫]

উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, ভারতীয় বাংলা ও বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের কোনো কোনো অংশ যে অনেক প্রাচীন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

---

৩. মুহম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬।

৪. রামশরণ শর্মা। ভাষান্তরঃ সুমন্তর চট্টোপাধ্যায়।। প্রাচীন ভারত (১ম সংস্করণ, কলকাতা-১৯৭৫) পৃ. ১৯৫।

৫.যতীন্দ্রমোহন রায়। ঢাকার ইতিহাস (২য় সংস্করণ, কলকাতা- ২০০০) পৃ.৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা লিপির প্রাচীনত্ব
ও
লিপিতত্ত্ববিদদের অভিমত।

বাংলা লিপির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে যে সব মত প্রচলিত রয়েছে, তা আলোচনা করলে জানা যায়; এই উপমহাদেশের প্রাচীনতম দুটি লিপির নাম ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী। প্রাচীন এ দুটো লিপির মধ্যে ব্রাহ্মী লিপি থেকে পরবর্তীকালে বহু বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা লিপির উদ্ভব এবং আরও পরবর্তীকালে এর বিকাশ হয়েছে। প্রচলিত এ মতবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো– খ্রীষ্টীয় সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্মীলিপি অপরিবর্তিত থাকে। খ্রীষ্টীয় প্রথম ও তৃতীয় শতক পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে কুশান লিপি নাম ধারণ করে। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত আরো পরিবর্তিত হয়ে গুপ্ত লিপি নামে পরিচিত হয়। ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে এ লিপি কুটিল লিপি নামে পরিচিত হয়ে আঞ্চলিক রূপ লাভ করতে থাকে। পূর্বাঞ্চলীয় লিপি পরবর্তীকালে পূর্বী ও পশ্চিমী নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়।

এই পূর্বী শাখায় বর্ণমালা প্রচীন যুগের পূর্বাঞ্চলীয় বর্ণমালা হতে পৃথক হয় এবং স্বাধীন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মূল বাংলা বর্ণমালার আকার লাভ করে। প্রচলিত মতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিংবা উক্ত মতের বিপক্ষে লিপিতাত্ত্বিকগণ যে সব অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাও এখানে আলোচনা করা আবশ্যক।

বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে James George Buhler একটি নতুন মত উপস্থাপন করেছেন তা হলো-"নাগরী লিপির দুটি প্রকারভেদ গড়ে উঠেছিল, পূর্ব ভারতীয় ও পশ্চিম ভারতীয়। ব্যুহলারের (Buhler) মতে এর পূর্ব ভারতীয় রূপটি থেকেই প্রত্ন-বাংলা (Proto- Bengali Script) খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গড়ে উঠে"। [৬]

ব্যুহলারের অভিমতটি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, এ অভিমতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, 'বাংলালিপির নিজস্ব রূপটি খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে গড়ে উঠেছিল বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন'। [৭]

---

৬. উদ্ধৃত।। ড. রামেশ্বর শ। সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা ,(৩য় সংস্করণ, কলকাতা- ১৯৮৪) পৃ.৪৮২।
৭. ড. রামেশ্বর শ। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮২।

Dhaka University Institutional Repository

" এই প্রত্ন-বাংলালিপির প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নারায়ণ পালের বাণগড় তাম্র শাসনে(খ্রী. নবম শতাব্দী) এবং মহীপালের বাণগড় দানলিপিতে(আনুমানিক ৯৭৫-১০২৬ খ্রী.)" ।[৮]

ব্যুহলার অন্যত্র অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, "এত স্থানীয় ভেদ, এত অসংখ্য দ্রুত লিখিত হস্তলিপি দ্বারা যে কোন ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে , অশোকের সময় লিপির একটি দীর্ঘ ইতিহাস ছিল এবং সেই সময় ভারতীয় বর্ণমালা একটি পরিবর্তনের অবস্থায় ছিল ।" [৯]

ব্যুহলারের উপর্যুক্ত মতটি স্বীকার করে নিয়ে বলা যায় যে, যেহেতু ভারতীয় লিপির একটি দীর্ঘ ইতিহাস ছিল এবং তা পরিবর্তনের অবস্থায় ও স্থানীয় ভেদের মধ্যে ছিল, সে কারণে নাগরীর পূর্বী শাখা থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে R.D.Banerji ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, 'অষ্টম শতাব্দীতে উত্তর ভারতীয় বর্ণমালা তিন অথবা চারটি শাখায় বিভক্ত হয়।পশ্চিমা এবং আফগানিস্তানের বর্ণমালা ভারতীয় বর্ণমালার পুরাতন পশ্চিমা শাখা থেকে উৎপন্ন হয়। এরপর পশ্চিমের বর্ণমালা এর মূল রূপ হারিয়ে ফেলে, এবং পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অপর দিকে উত্তর ভারতীয় বর্ণমালার উত্তর-পশ্চিম শাখা থেকে প্রত্ন-বাংলালিপি উৎপন্ন হয়। আর এই নতুন বাংলা বর্ণমালার ওপর নাগরী বর্ণমালার খুব কমই প্রভাব পড়েছিল।' এ বিষয়ে বলা হয়েছে,

"It has been come possible to show, that proto Bangla forms were evolved in the North East long before the invasion of Northern India, by the Nagari alphabet of the south west and that Nagari has had very little influence upon the development of the Bengali Script" [১০]

আবার অন্যত্র ব্যানার্জী বলেছেন, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে গয়া এবং বেনারসে ব্যবহৃত বর্ণমালার মধ্যে খুব কমই সাদৃশ্য লক্ষ্য করা য়ায় এবং খুব দ্রুতই তা পরিবর্তন হয়ে প্রত্ন-বাংলা লিপির উৎপন্ন হয়। আর খ্রীষ্ট্রীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আধুনিক বাংলা বর্ণমালা পূর্ণতা লাভ করে ।

৮.ড. রামেশ্বর শ। পূর্বোক্ত.পৃ.৪৮২।

৯.উদ্ধৃতঃ কল্পনা ভৌমিক। পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা (১ম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী সাল- ১৯৯২) পৃ.১৩।

১০. R.D. Banerji. The Origin of the Bengali Script. (Nababharat Publishers, Reprint-1973) P-2.

Dhaka University Institutional Repository

এই সম্পর্কে তিনি The Origin of the Bengali Script গ্রন্থে বলেন, "With the introduction of the Nagari Script in the 10th century, the western limit of the use of the Eastern alphabet was still further redueed .In the 11th century, we find that there is very little similarity between the alphabet used in Benares and that used in Gaya. The progress of the changes has been very rapid, and alphabet in the 11th century .In the 12th century, we find further changes, which make the information of the modern Bengali alphabet almost complete".[১১]

আলোচ্য মতটি পরীক্ষা করলে দেখা যায়, একাদশ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্ন-বাংলা লিপির আধুনিক রূপের পূর্ণতা লাভ করে । ইতঃপূর্বেই জানা গিয়েছে যে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নারায়ণ পালের তাম্র শাসনে এবং মহীপালের বাণগড় দানলিপিতে (আনুমানিক ৯৭৫-১০২৬) প্রত্ন বাংলা লিপির নিদর্শন পাওয়া যায়। তাছাড়াও "প্রথম মহীপালের সময় কালের (৯৭৫-১০২৬ খ্রিষ্টাব্দ) দু'টী পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা 'পাণ্ডুলিপি। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত এ পাণ্ডুলিপির লিপিকার ৯৭৯-৮৯ খ্রিস্টাব্দ।অপর দিকে রয্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এ (নং ৯৯৯৫) সংরক্ষিত নামহীন পাণ্ডুলিপি লিপিকাল মহীপালের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে অর্থাৎ ৯৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দ।এর লিপি বেশ পরিণত"। [১২]

তাহলে বাংলা লিপি যে আরো প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই জনাব R.D. Banerji- এর মত গ্রহণ করা কঠিন।

বাংলা লিপির উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে যে বিভিন্ন ধরনের অভিমত চালু আছে ,তার মধ্যে একটি মত হলো ,দেবনাগরী থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ হয়েছে। কিন্তু ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই অভিমত অস্বীকার ও খণ্ডন করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন – "আজকাল সাধারণতঃ দেবনাগরী বর্ণমালার সংস্কৃত বই ছাপানো হয় বলিযা অনেকের ধারণা যে দেবনাগরীই ভারতের প্রাচীনতম বর্ণমালা এবং এই দেবনাগরী হইতে বাঙ্গালা বর্ণমালার উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে ,বাঙ্গালা ও দেবনাগরী পরস্পর ভগিনী সম্পর্কে সম্পর্কিত।

১১. R.D. Banerji. পূর্বোক্ত.পৃ. ৩।

১২. ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম।। পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা (৪র্থ সংস্করণ,গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০) পৃ.১৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

দেবনাগরী হইতেছে গুজরাট ও রাজস্থান এবং সংযুক্ত প্রদেশের পশ্চিম খণ্ডের মধ্যে উদ্ভূত বর্ণমালা , গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত রাজাদের প্রভাবের ফলে সমগ্র উত্তর ভারতে ও অন্যত্র ইহার প্রসার ঘটিয়াছে" ।[১৩]

বাংলা লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আরো একটি অভিমত হলো–

"উত্তর ভারতে ব্রাহ্মীলিপি, কুষাণ ও গুপ্তরাজাদের আমলে পরিবর্তিত হইয়া ,কালক্রমে সম্রাট হর্ষবর্ধনের পরে ,সপ্তম শতকে , তিনটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে --------- এই তিনটি রূপের মধ্যে উত্তর পশ্চিমে (কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে) প্রচলিত রূপের নাম 'শারদা' দক্ষিণ পশ্চিম (রাজস্থান, মালব ও গুজরাটে) এবং মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত রূপের নাম 'নাগর' এবং পূর্ব ভারতের রূপের নাম 'কুটিল'। মূল ব্রাহ্মীলিপির এই কুটিল রূপ ভেদ হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি 'নাগর হইতে দেবনাগরীর' এবং 'শারদা' হইতে পাঞ্জাবের গুরুমুখীর উৎপত্তি। বাঙ্গালা ও দেবনাগরী লিপি পরস্পর হইতে স্বাধীন' এবং এই দুই লিপি মাত্র গত হাজার বছর হইল বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।" [১৪]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের আভিমত গ্রহণ করা কঠিন। কুটিল লিপি হতে বাংলা লিপির জন্ম হতে পারে না । কারণ 'কুটিল লিপি গুপ্ত লিপি থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং এ লিপি থেকেই নাগরী ও শারদা লিপির উৎপত্তি হয়েছে' বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৫]

তাছাড়া বাংলা লিপি একহাজার বছর আগে বিশিষ্টতা লাভ করেনি। ইতঃপূর্বেই আলোচিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মহীপালের বাণগড়ের লিপিতে বাংলা লিপি উৎকীর্ণ হয়েছে।

বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জনাব শ্রীনাথসেন বলেছেন,"দেবনাগরী থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ "। [১৬]

শ্রীনাথসেন তাঁর 'ভাষাতত্ত্ব' গ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণের সাদৃশ্য দেখিয়ে এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

ধ্বনিতাত্ত্বিক জনাব মুহম্মদ আবদুল হাইও বলেন, " বাংলা বর্ণমালা দেবনাগরী বর্ণমালার আদর্শে গঠিত।" [১৭]

তাঁদের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ দেবনাগরী লিপিতে সংস্কৃত পুথি প্রচুর লেখা হয়েছিল, আর দেবনাগরীর উৎপত্তি হয়েছিল নাগর ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

---

১৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, (৭ম সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৬২) পৃ.১১৫।

১৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত পৃ. ১১৬-১১৭।

১৫. গৌরীশঙ্কর হীরা চাঁদ ওঝা। অনুবাদ ও সম্পাদনায়: মণীন্দ্রনাথ সমাজদার। প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা, (১ম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী-১৯৮৯) পৃ.৮০।

১৬. ড.মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত পৃ.১৭২।

১৭. মহম্মদ আবদল হাই। ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনি তত্ত্ব.(তৃতীয় প্রকাশ. বর্ণ মিছিল. ঢাকা-১৯৭৫)প.৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ একটি ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, "বাংলা এবং দেবনাগরী উভয় লিপিই ব্রাহ্মী লিপি থেকে প্রাচীনতর"।[১৮]

সতীশচন্দ্র তাঁর মত সম্পর্কে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করেছেন এবং তাঁর যুক্তির মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থে বঙ্গ লিপির উল্লেখ আছে।বিদ্বানগণ তাঁর যুক্তি গ্রহণ না করে বলেছেন, "ললিত বিস্তর এর তালিকায় অধিকাংশ নামই কাল্পনিক এবং লিখন রীতি অর্থে 'সেখানে লিপি শব্দের ব্যবহার রয়েছে।" [১৯]

লিখন রীতি অর্থে লিপির নামকরণ হয়েছে এর অর্থও পরিষ্কার নয়। কারণ লিখন রীতি ভিন্ন ভিন্ন বলেই তো লিপির নামকরণও ভিন্ন ভিন্ন হয়। কাজেই সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতামত এক কথায় অস্বীকার করা যায় না, এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জনাব ড. সুকুমার সেন অভিমত প্রকাশ করেছেন ,'কুটিল লিপি হইতে বাংলা লিপির উদ্ভব।'[২০]

ড. সুকুমার সেনের মত পরীক্ষা করলে দেখা যায়– কোন কোন লিপিতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারত বর্ষের প্রাচীন দুটি লিপি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠীর এর মধ্যে, ব্রাহ্মী লিপি তিনটি প্রধান আঞ্চলিক লিপি রূপে বিভক্ত হয়। এই তিনটি ভাগ হলো উত্তর ভারতীয়, দক্ষিণ ভারতীয় ও বহির্ভারতীয়।

উত্তর ভারতীয় লিপি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়। তার একটি পূর্বী অপরটি পশ্চিমা । পূর্বী ধারাটি আবার পূর্বী ও পশ্চিমা নামে দুটি ধারায় আত্মপ্রকাশ করে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত লিপির পশ্চিমা উপধারা থেকে একটি জটিল রূপ গড়ে উঠে, যার নাম হয় কুটিল লিপি। আর কুটিল লিপি থেকে বাংলা লিপির জন্ম হয়েছে বলে ধরা হলেও বাংলা লিপির মূল যে কুটিল লিপি তারই উৎস নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে।

আবার ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এর মতে, "গুপ্ত যুগেই প্রথম প্রাদেশিক বর্ণমালার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও প্রভেদ বাড়িয়া উঠে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ব ভারতের ও পশ্চিম ভারতের বর্ণমালা দুইটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে। পশ্চিম ভারতের সিদ্ধমাতৃকা বর্ণমালা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইতে হইতে নাগরীতে পরিণত হয়। আর পূর্বভারতের বর্ণমালার হইতে অবশেষে বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি হয়।"[২১]

তাই বাংলা লিপির উদ্ভব সাক্ষাৎ কুটিল লিপি থেকে হয়েছে বলে মেনে নেওয়া কঠিন। বাংলা লিপির উদ্ভব সম্পর্কে এস. এন. চক্রবর্তীর অভিমত হলো, "প্রস্তরে.খোদিত উত্তর ভারতীয় লিপির দুটি শাখা ছিল পূর্বী এবং পশ্চিমা ।

১৮. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা, পৃ.১৭২।
১৯. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা, পৃ.১৭৩।
২০. উদ্ধৃত। ড রামেশ্বর শ। পূর্বোক্ত পৃ.৪৮২।
২১. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার। পূর্বোক্ত, পৃ.১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিমা শাখাটি থেকে সিদ্ধমাতৃকা লিপির জন্ম হয়। আর পূর্বী শাখাটি থেকে স্বতন্ত্র ধারায় প্রত্ন-বাঙ্গালা লিপির জন্ম হয় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতেই"।[২২]

এস.এন চক্রবর্তীর অভিমত মেনে নিলেও কাল বিচারে তা গ্রহণ যোগ্য নয়, কারণ ইতঃপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে প্রত্ন-বাংলা লিপির নিদর্শন পাওয়া যায় নারায়ণ পালের তাম্র শাসনে (খ্রী. নবম শতাব্দী)।

বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে দেব নাগরী লিপির ভুমিকা অস্বীকার ও খণ্ডন করে ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, "ব্রাহ্মী অক্ষর খ্রিষ্টীয় ৮ম -১০ম শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালা অক্ষরের জন্ম দান করিয়াছেন। দেব নাগরী অক্ষর হইতে বাঙ্গালা লিপির জন্ম হয় নাই। কারণ নাগরী অক্ষরের আদিম রূপ দক্ষিণ পশ্চিমে নাগরী লিপি উত্তর ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের পুর্বেই বাঙ্গালা লিপির প্রাথমিক নিদর্শন মিলিতেছে। দক্ষিণ পশ্চিমে এই নাগরী লিপি উত্তর পশ্চিম ভারতে আধিপত্য স্থাপন করে অনেক পরে অন্ততঃ দশম শতাব্দীর পূর্বে নহে"।[২৩]

ড. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় অন্যত্র লিখেছেন–"জাপানের কোন মন্দিরে খ্রিষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত গ্রন্থ রক্ষিত আছে।এবং যবদ্বীপে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত প্রত্নলিপি পাওয়া গেছে"।[২৪]

বন্দোপাধ্যায়- এর অভিমত মেনে নেওয়া কষ্টকর। কারণ ব্রাহ্মীলিপি থেকে বাংলা লিপির জন্ম হয়েছে এর অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।বাংলা লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে জনাব গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা বলেন, " এ লিপি নাগরীর পূর্ব শাখা থেকেই খ্রিষ্টীয়-১০ম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে উৎপন্ন হয়েছে। বাদাল স্তম্ভে খোদিত নারায়ণ পালের সময়ের লেখমধ্যে, যা খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর বলে নির্ধারিত বাংলা লিপির দিকে ঝোঁক দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ থেকেই খ্রিষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর নেপালী লিপি (নেওয়ারী) এবং বর্তমান বাংলা, মৈথিলী এবং উড়িয়া লিপির উৎপত্তি হয়েছে"।[২৫]

গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝার মন্তব্য মেনে নেওয়া চলে না। কারণ নাগরী লিপি বাংলা লিপির চেয়ে প্রাচীন নয়। এ সম্পর্কে জনাব রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, "আর নাগরী অক্ষর বাংলা অপেক্ষা প্রাচীন নহে; অর্থাৎ বাংলাদেশে ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত বর্তমান বাংলা অক্ষরের যে সম্বন্ধ, ঐ সময়ে পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত বর্তমান নাগরী অক্ষরের সম্বন্ধ তদপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ নহে।"[২৬]

২২.উদ্ধৃত। ড. রমেশ্বর শ। পূর্বোক্ত পৃ. ৪৮৩।

২৩. উদ্ধৃত। ড.রমেশ্বর শ। পূর্বোক্ত ৪৮৪।

২৪.উদ্ধৃত। ড. রমেশ্বর শ।পূর্বোক্ত ৪৮৪।

২৫. গৌরী শঙ্কর হীরা চাঁদ ওঝা। অনুবাদ ও সম্পাদনায়: মণীন্দ্রনাথ সমাজদার। প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা, (১ম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী-১৯৮৯) পৃ.৮১।

২৬. ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার। পূর্বোক্ত পৃ.১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে সাম্প্রতিক অভিমত

বাংলা লিপির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে ড. এস. এম. লুৎফর রহমান প্রচলিত মত আলোচনা করে একটি নতুন অভিমত দান করেছেন। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বাংলা লিপির উৎপত্তির কথা স্বতন্ত্র ও মৌলিকভাবে প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দাঁড় করাতে পারেননি। কিন্তু জনাব রহমান প্রচলিত মত আলোচনা করেও তথ্যভিত্তিক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন । তাঁর মতে, "গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, অসুর, (রক্ষ-রাক্ষস?) নাগ, গরুড়, মৃগ, মহোরগ প্রভৃতি লিপি সম্ভবতঃ নেপাল, ভুটান, সিকিম, তিব্বত ইত্যাদি এলাকার জনগোষ্ঠীর লিপি (Script)। এ ছাড়া ঐ তালিকায় স্পষ্টরূপে দু'টি বর্হিভারতীয় চীনা ও যবদ্বীপীয় লিপির উল্লেখ লক্ষণীয়। এসব লিপির মধ্যে 'নাগরী' লিপির কোন উল্লেখ নেই, তা স্পষ্ট, কিন্তু ব্রাহ্মী লিপির উল্লেখ বিদ্যমান। তবে আলোচ্য তালিকার ২৫ সংখ্যক "দেবদের" লিপি "দেবনাগরী" লিপি বলে সন্দেহ করার হেতু আছে। আমার মনে হয়, দেবতা বা ব্রাহ্মণদের মধ্যে গোপনে প্রচলিত লিপি 'দেব' লিপি, যা পরে দেবনাগরী লিপি নামে খ্যাত হয়। তা যদি সত্য হয়, তা হলে ব্রাহ্মীলিপি থেকে দেবনাগরী বা নাগরী লিপির উৎপত্তি এ অভিমত বাতিল হয়ে যায়। ব্রাহ্মীলিপি থেকে বঙ্গলিপি বা নাগরী লিপি কোনটি উৎপত্তি হয়নি বলে স্বীকার করা সঙ্গত। পূর্বোক্ত দেবদের লিপিকে দেবনাগরী লিপি বলে গ্রহণ করলে নাগরী লিপি থেকে বাংলা লিপির উৎপত্তি কল্পকথাও ধোপে টেকে না। 'ললিতবিস্তরে' একই সময়ে পর পর ৫টি লিপির উল্লেখ হরা হয়েছে। তার পঞ্চম স্থানে 'বঙ্গের' লিপির অবস্থান। এই অনুক্রমে ব্রাহ্মীলিপি থেকে বাংলা লিপির স্বতন্ত্র সত্তা ও উৎসেরই প্রমাণ"।[২৭]

এছাড়া তিনি 'ললিতবিস্তরে' যে ৬৪টি লিপির কথা আছে, তা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলো--

"

ক্রমিক নম্বর	নাম	ক্রমিক নম্বর	নাম	ক্রমিক নম্বর	নাম
১	ব্রাহ্মী	২৭	যক্ষলিপি	৫৩	দ্বিরুত্তর পদসন্ধি
২	খরোষ্ঠী	২৮	গন্ধর্ব	৫৪	দশোত্তর পদসন্ধি
৩	পুষ্করশারী	২৯	কিন্নর	৫৫	পাদলিখিত
৪	অঙ্গলিপি	৩০	মহোরগ	৫৬	অধ্যাহারিণী সংগ্রণী
৫	বঙ্গলিপি	৩১	অসুর	৫৭	বিদ্যানুলোম
৬	মগধলিপি	৩২	গরুড়	৫৮	বিসিশ্রিত
৭	মাঙ্গল্যলিপি	৩৩	মৃগচক্র	৫৯	ঋষিতপস্তপ্তন
৮	মনুষ্যলিপি	৩৪	চক্রলিপি	৬০	রোচমানী ধরণী প্রেক্ষণ
৯	অঙ্গুলী লেখন	৩৫	বায়ুমরুৎ	৬১	সর্বৌষধি নিষ্যদ্যা

২৭. ড. এস. এম. লুৎফর রহমান। বাঙালা লিপির উৎস্য ও বিকাশের অজানা ইতিহাস। (বাংলা একাডেমী কর্তৃক শীঘ্রই প্রকাশিতব্য), পৃ. ১-১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

১০	শকারীলিপি	৩৬	ভৌমদেব	৬২	সর্বৌরসাধিনীস্যন্দ
১১	ব্রহ্মাবল্লীলিপি	৩৭	অন্তরীক্ষদেব	৬৩	সর্বভূতরুত গ্রহণী
১২	দ্রাবিড়লিপি	৩৮	উত্তর কুরুদ্বীপ	৬৪	সর্বসার সংগ্রহণী
১৩	কানাড়ীলিপি	৩৯	অপর গৌড়		
১৪	দক্ষিণলিপি	৪০	পূর্ব বিদেহ		
১৫	উগ্রলিপি	৪১	উৎক্ষেপ		
১৬	সংখ্যালিপি	৪২	নিক্ষেপ		
১৭	অনুলোমলিপি	৪৩	বিক্ষেপ		
১৮	অর্ধধনুলিপি	৪৪	প্রক্ষেপ		
১৯	দারদলিপি	৪৫	সাগর		
২০	খাস্যলিপি	৪৬	বজ্র		
২১	চীনালিপি	৪৭	লেখ-প্রতিলেখ		
২২	হূনলিপি	৪৮	শাস্ত্রাবর্ত		
২৩	মধ্যাক্ষরবিস্তরা	৪৯	গণনাবর্ত		
২৪	পুষ্পলিপি	৫০	উৎক্ষেপাবত		
২৫	দেবদেরলিপি	৫১	নিক্ষেপাবত		
২৬	নাগলিপি	৫২	সর্বরুত		

(ললিতবিস্তর দশম অধ্যায়)"।[২৮]

আবার জৈন ধর্মাবলম্বীদের "পঞ্ঞাবানাস্তসূত্ত" নামক একখানি গ্রন্থে ৩৯ প্রকার বর্ণলিপির নাম পাওয়া যায়। সেগুলো হলো–

"১। পরবর্তী আরবী লিপি, ২। দেবনাগর লিপি, ৩। আদি সিলেটী নাগরী লিপি, ৪। পরবর্তী সিলেটী নাগরী লিপি, ৫। বঙ্গ লিপি, ৬। মনিপুরী লিপি, ৭। চাকমা লিপি, ৮। আদি অহোম লিপি, ৯। পরবর্তী অহোম লিপি, ১০। তিব্বতী লিপি, ১১। গুজরাটী লিপি, ১২। উড়িয়া লিপি, ১৩। কুটিল লিপি, ১৪। গুরুমুখী লিপি, ১৫। মুলতানী লিপি, ১৬। সিন্ধি লিপি, ১৭। কেনারী লিপি, ১৮। তেলেগু লিপি, ১৯। পাণ্ড্য লিপি, ২০। মন লিপি, ২১। তামিল লিপি, ২২। তুলু লিপি, ২৩। পিউ লিপি, ২৪। পতিমুখ লিপি, ২৫। চোল লিপি, ২৬। পালি লিপি, ২৭। পরবর্তী চালুক্য লিপি, ২৮। মালয়ালম লিপি, ২৯। আদিশ্যাম দেশীয় লিপি, ৩০। পরবর্তী শ্যাম লিপি, ৩১। অধুনা সিংহী লিপি, ৩২। পরবর্তী জভা লিপি, ৩৩। ছা-ল্ন্হ্ লিপি, ৩৪। ব্রহ্মদেশীয় কিয়কদাহ্ লিপি, ৩৫। ভেসমগিরি লিপি, ৩৬।এরলঙ্গ লিপি, ৩৭। ভট্টে-লুট্টু লিপি, ৩৮। ব্রাহ্মী লিপি, ৩৯। খরোষ্ঠী লিপি।"[২৯]

উপর্যুক্ত লিপিগুলোর তালিকা লক্ষ করলে দেখা যায়, ৫ নম্বরে বঙ্গলিপির উল্লেখ রয়েছে।

২৮. ড. এস এম লুৎফর রহমান । পূর্বোক্ত, পৃ. ১-১৪৮।

২৯। দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা। বর্ণমালার উদ্ভব বিকাশ ও লিপি সভ্যতার ইতিহাস,(প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২০০৩), পৃ. ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

এ সকল কারণে, ড. রহমানের অভিমতকে এক কথায় অস্বীকার বা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ 'ঐতরেয়' আরণ্যকে গ্রন্থে আজকের আধুনিক বাংলাদেশকে 'বঙ্গ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই আজকের আধুনিক বাংলার বর্ণমালার বেশিরভাগ হরফই যে ব্রাহ্মীলিপির সমকালীন, এটি অসম্ভব বলে মনে করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। 'ললিতবিস্তর' (দ্বিতীয় শতক) যে বঙ্গলিপির উল্লেখ আছে তা যে আজকের আধুনিক বাংলা বর্ণমালার মূল উৎস তা অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়াও লিপির পরিবর্তন বা উৎকর্ষ সাধন একদিনে সম্ভব নয়।

এই সম্পর্কে হরপ্পা লিপির উদাহরণ টানা যায়, "হরপ্পা লিপি সম্পর্কে বলা হয়েছে– " সাতশত বছরে এই লিপি হুবহু একই রকম থেকে গিয়েছে। সাধারণতঃ দেখা যায় গোড়ার দিকে অক্ষর বা চিহ্নের সংখ্যা থাকে অনেক বেশি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা কমতে থাকে। সুমেরু এ লেখা শুরু হবার গোড়ার দিকে ৯০০ টি চিহ্ন ব্যবহৃত হতো। উরুখ-এ ২০০ টি। কিন্তু হরপ্পায় চিহ্নের সংখ্যা প্রায় ২৭০। তার মানে এটি গোড়ার অবস্থা নয় অনেক খানি পরিণত। অথচ এতখানি পরিণত লিপি, সাতশত বছরেও আরো পরিণত হয়ে ওঠেনি"। [৩০]

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রতিকূল পরিবেশে একটি ভাষা ও লিপির বিলুপ্তি ঘটতে পারে। আবার অনুকূল পরিবেশে অনেক মৃতপ্রায় ভাষারও পুনরুজ্জীবন ঘটতে পারে । এ সম্পর্কে 'দৈনিক ইত্তেফাকে' প্রকাশিত 'এই শতকে ৬৮০০ ভাষা বিলুপ্ত হইবে' শীর্ষক রিপোর্ট থেকে জানা যায় কিভাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষার বিলুপ্তি ঘটতে পারে। এ সম্পর্কে 'দৈনিক ইত্তেফাকে' প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে– "ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইন্সটিটিউট বলিয়াছে, চলতি শতকের শেষ নাগাদ পৃথিবীর মোট ৬৮০০ ভাষা অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা নব্বইটি ভাষা বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। ইন্সটিটিউটের অন্যতম গবেষক পায়েল সম্পত ইন্সটিটিউটের মে-জুন সংখ্যার সাময়িকীতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, আলাস্কার প্রিন্স আলাস্কা সাউন্ডের অধিবাসী ও নাভাঞ্জো ইন্ডিয়ান মেরি স্মিথ এইয়াক ভাষার কথা বলেন। তিনি একমাত্র জীবিত ব্যক্তি যিনি এই ভাষায় কথা বলিতেছেন। আমাজানের অরণ্যবাসী মাত্র ৬ ব্যাক্তি আরিকাকো সাইবেরিয়ায় আনুমানিক ১০০ ব্যক্তি 'উজিহ' ভাষায় কথা বলেন।

৩০. অমল দাশগুপ্ত । মানুষের ঠিকানা, (১ম সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৯) পৃ. ২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইউনেস্কো প্রসঙ্গত জানাইয়াছে, কোন ভাষায় অস্তিত্বের নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষার জন্য ঐ ভাষায় কমপক্ষে একলক্ষ ভাষা-ভাষী থাকা প্রয়োজন। যুদ্ধ, গণহত্যা, ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আধিপত্যশীল ভাষা গ্রহণ এবং ভাষা বিশেষের উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদির কারণে অনেকটা বিভিন্ন প্রাণী প্রজাতির বিলুপ্তির মতই ভাষার বিলুপ্তি ঘটিয়া থাকে। ---------- তবে ভাষাবিদদের বিশ্বাস, একুশ শতকের শেষ নাগাদ ৩৪০০ হইতে ৬১২০ টি ভাষা বিলুপ্ত হইবে। প্রতি দুই সপ্তাহে পৃথিবীর একটি করিয়া ভাষা মৃত্যুবরণ করে। আবার চীনা, গ্রীক ও হিব্রুর মত কিছু প্রাচীন ভাষার পুনরুজ্জীবন ঘটিতেছে। হাওয়াই দ্বীপে হাওয়াই ভাষার আবার প্রচলন ঘটিতেছে।"[৩১]

এ রিপোর্ট থেকে মনে করা যেতে পারে যে, বাংলা ভাষা ও লিপির ক্ষেত্রেও অতীতে ওরকম বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রাচীন বাংলার উন্নত মানের সভ্যতার নিদর্শন খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সালে থেকে পরিচয় পাওয়া যায়, কাজেই তখনকার দিনেও এই অঞ্চলের উন্নত সভ্যতার অধিকারী প্রাচীন জনগোষ্ঠী যে নতুন লিপির ব্যবহার চেষ্টা করেনি বা ব্যবহার করেনি তা বলা যায় না। বরং এটাই সম্ভব ও স্বাভাবিক যে তারা উন্নত মানের লিপি ব্যবহারের প্রচলন করেছিল। তাছাড়াও অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, 'খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে অনুলিখিত একটি পুথির লিপি মাল্য দুই একটি ব্যতীত প্রায় হুবহু আধুনিক বাংলা লিপির মতই'।[৩২]

স্বাভাবিকভাবেই বলা যেতে পারে খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে অনুলিখিত একটি লিপি মালা যদি হুবহু আধুনিক বাংলা লিপির মত হয়, তাহলে বাংলা লিপির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস যে অনেক পুরোনো তা নিশ্চিত করে বলা যায়। এ জন্য ড. এস. এ. লুৎফর রহমানের অভিমত–" বাঙালা লিপির প্রাচীনত্ব বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষাও প্রাচীন এবং 'ললিতবিস্তরে' এই লিপির উল্লেখ ও নির্ভর যোগ্য"।[৩৩]

ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বাংলালিপির প্রাচীনত্বের ইঙ্গিত করে বলেন–
"যদি ললিতবিস্তর-এর প্রমাণ গণ্য করা যায়, তবে ২২০০ বৎসর পূর্বেও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল"।[৩৪]

তাছাড়াও একটি লিপি যে শত শত বছর ধরে একই রূপ থাকতে পারে তারও বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া বলেন, "অনুস্বার হরফটিও অশোকের শিলালিপি (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) থেকে শুরু করে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত অভিন্ন আকারে চালু থেকেছে।"[৩৫]

৩১. এই শতকে ৬৮০০ ভাষা বিলুপ্ত হইবে! শীর্ষক রিপোর্ট থেকে, দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই আষাঢ়-১৪০৮ (২০শে জুন ২০০১)
৩২.. দ্রষ্টব্য- Catalogue of the Buddhist Sanskrit, Manuscripts in the University library. Cambridge Ceil (Bendall) M.A. Cambridge University Press 1883.
৩৩. ড. এস. এম. লুৎফর রহমান। পূর্বোক্ত, পৃ. ১-১৪৮।
৩৪. উদ্ধৃত। ড. এস. এম. লুৎফর রহমান। বাঙালীর লিপি-ভাষা, বানানও জাতির ব্যতিক্রম ইতিহাস (১ম খণ্ড), (১ম প্রকাশ, ঢাকা-২০০৪), পৃ. ৮৪।
৩৫.মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া। বাংলা হরফ, অনুস্বারঃ বিবর্তনের ধারায় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা-১৯৮১) পৃ.৭৮-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ কারণে 'ললিতবিস্তরে' (২য় শতক খ্রী.) উল্লেখিত বঙ্গলিপি যে আজকের আধুনিক বাংলা লিপির মূল তা মেনে নেওয়া চলে।

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে বঙ্গা শব্দযুক্ত লিখিত একটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন, তা নিম্নরূপ–

> "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানী মানী বয়াংসি
> বঙ্গাবগধাশ্চের পাদান্যন্যা অকার্মভিতো বিমিশ্র ইতি।
> ঐতরেয় আরণ্যক ২/১/১"[৩৬]

কাজেই ঋকবেদের শাখা ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে উল্লেখিত 'বঙ্গ'কে যেমন আধুনিক বাংলাদেশের আদি নাম ধরা হয়, তেমনি 'ললিতবিস্তরে' উল্লেখিত 'বঙ্গলিপি'ও আধুনিক বাংলা লিপির মূল বলে মেনে নিতে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়।

উপসংহারে বলা যায়, বাংলা লিপি প্রাচীন বঙ্গের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি–

এ-মত বিদ্বানগণ গ্রহণ করলে বাংলা লিপির উৎস ও বিকাশ সম্পর্কে নতুন ও যথার্থ স্বীকৃতি লাভ করবে বলে মনে করা যায়।

---

৩৬. রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়। বাঙ্গালার ইতিহাস, (১ম প্রকাশ, কলকাতা-১৩২৪ বাংলা) পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

- চর্যাপদের লিপি- বিচার ও বৈচিত্র্য নির্দেশ।
- ঐতিহাসিক যুগের শিলালেখে বাংলালিপির ব্যবহার ও বৈচিত্র্য নির্দেশ।
- ঐতিহাসিক যুগে বাংলা পাণ্ডুলিপিতে বাংলালিপির ব্যবহার-বৈচিত্র্য (১৪০১-১৮০১)।

Dhaka University Institutional Repository

চর্যাপদের লিপি-বিচার

'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি'র সমগ্র অংশই যে প্রাচীন বাংলা লিপিতে লিখিত তা মোটামুটি স্বীকৃত। তবে নেপালী পুথি-বিশারদগণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন, 'চর্যাপদ পুরানো নেওয়ারী লিপিতে লিখিত'।[৩৭]

তাঁরা অবশ্য একথাও স্বীকার করেন, "যে সময়ে এই সব চর্যাগীতি রচিত হ'য়েছিল, তখন মৈথিলীর সঙ্গে বাঙ্‌লা বা অসমীর (লিপির) তেমন কোন পার্থক্য ছিলনা"।[৩৮]

নীলরতন সেন অনুমান করেন, "শাস্ত্রী আবিস্কৃত 'চর্যাগীতি কোষ' পুথিতে যে-লিপি ব্যবহার করা হ'য়েছিল সেটি প্রাচীন এমন একটি লিপি যা, সম্ভবতঃ তখন বাঙ্‌লা, অসমীয়া, মৈথিলী, ওড়িয়া এবং নেওয়ারীতে ব্যবহৃত হত"।[৩৯]

চর্যালিপির পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে নীলরতন সেন লিখেছেন, "এ পুথির- 'উ' স্বরধ্বনি 'ঊ' এবং ব্যঞ্জন ধ্বনি ড/ড় এর মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন। তেমনি আবার ট এবং ঢ/ঢ় এর মধ্যেও পার্থক্য নেই। ব এবং চ-তে লিপিগত পার্থক্য থাকলেও লিপিকর অনেক সময় সে পার্থক্য রাখেননি। ছ এবং যুক্তাক্ষর চ্ছ- এর মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। কৃ, কু, ক্য, ক্, চ এ জাতীয় যুক্ত-বর্ণ লিপিতেও বিশেষ পার্থক্য করা যায় না। পুথিতে ভ এবং ত-এর আকার পৃথক হ'লেও মাঝে মাঝে লিপিকর পাঠককে ভ্রান্তিতে ফেলেছেন। তেমনি মাঝে মাঝে সংশয় সৃষ্টি করেছেন ন এবং র, নৃ এবং ন্ব, ণ এবং স- এর বর্ণলিপিতে। অনুস্বার এবং চন্দ্রবিন্দুর চিহ্নও অভিন্ন র'য়েছে। চর্যাগীতি পুথির সঠিক পাঠ নির্ণয়ের এই বর্ণলিপিগত ভ্রান্তি-অবকাশ একটি প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হবে"।[৪০]

নীলরতন সেন চর্যাপদের পুথি পর্যবেক্ষণ শেষে এ পুথির প্রত্যেকটি লিপি বিচার করে লিখেছেন–

৩৭. ড. এস.এম. লুৎফর রহ্‌মান। বৌদ্ধ চর্যাপদ, (ধারণী সাহিত্য সংসদ, ঢাকা- ১৯৯০) পৃ.৬০।
৩৮. নীলরতন সেন। চর্যাগীতিকোষ (কলিকাতা-১৯৭৮) পৃ. ঙ.চ।
৩৯. দ্রষ্টব্য। নীলরতন সেন। ঐ, পৃ.চ।
৪০. ড. এস.এম. লুৎফর রহ্‌মান। পূর্বোক্ত,পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

"স্বরবর্ণ-লিপিঃ

অ. আঃ চর্যাগীতিকোষে এই বর্ণদুটির রূপ হল অ. আ অথবা অ. আ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই বর্ণদ্বয়ের প্রতিলিপি হল অ, আ ঃ অনেকটা চর্যাপুথির প্রথম বর্ণযুগলের মতো। চর্যাপদের দ্বিতীয় বর্ণযুগলের সঙ্গে মৈথিলী বর্ণদুটির বেশ মিল দেখা যায়ঃ অ. আ। চর্যাগীতির দুই ধরনের বর্ণযুগল থেকে অনুমতি হয়, লিপিকর দুই রীতির বর্ণ লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন। ওড়িয়াতে বর্ণদুটির রূপ হল অ, আ বর্ণদুটির বাংলা ও অসমীয়া আধুনিক রূপ হল অ, আ। নেওয়ারী অ. আ। নাগরী অ, আ এই একই লিপিধারার অন্তর্ভুক্ত মনে হয়।

ই, ঈঃ চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণদুটির রূপ হল ই. ঈ। । দেখা যাচ্ছে, তখন ই-এর সঙ্গে দীর্ঘ-ঈকার যোগ করে ঈ লেখা হত। দুই শতকের মধ্যেই বর্ণদ্বয় যে অনেকটা আধুনিক রূপ নিয়েছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ই, ঈ -তে তার সাক্ষ্য মিলছে। নেওয়ারী মৈথিলী ওড়িয়া ই ঈ এবং নাগরী ই, ঈ- এর সঙ্গে চর্যালিপির যেমন সাদৃশ্য কম, তেমনি উপরোক্ত লিপিগুলির মধ্যেও পারস্পরিক তেমন আকৃতিগত মিল নেই। বাংলা-অসমীয়া আধুনিক লিপির (ই,ঈ) সঙ্গে মধ্যযুগীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপির বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে।

উ, ঊঃ চর্যাগীতি পুথিতে এই বর্ণদুটির রূপ হল উ, ঊ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণদ্বয়ের চিত্ররূপ প্রায় অভিন্ন উ. ঊ । মৈথিলীতে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে । নেওয়ারীতে উ, ঊ নাগরীতে উ, ঊ এবং ওড়িয়াতে উ, ঊ । লক্ষ করা যাচ্ছে, চর্যা বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগে মাথায় ইলেক দেবার পদ্ধিতি চালু হয়নি। মৈথিলীতে বিন্দুর আকারে তার আভাস এসেছে। আর ওড়িয়াতে সেটা প্রায় পুচ্ছের আকারে নীচে নেমে এসেছে। সম্ভবত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক থেকে বাংলা অসমীয়া উ, ঊ-এর বর্তমান রূপ সুস্পষ্ট হয়েছে।

এঃ চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির রূপ হলঃ এ ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এ, মৈথিলী এবং নেওয়ারীতে এ, ওড়িয়াতে ৮ । আধুনিক বাংলা-আসমীয়া লিপিরূপ হল এ। পূর্বী নব্য আর্যভাষাগুলিতে বর্ণটির লিপিগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। নাগরীতে বর্ণটির লিপিরূপ হলঃ । -পূর্বী ভাষাগুলির লিপি থেকে এখানে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

ওঃ চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির রূপ হলঃ ওা । এর সঙ্গে নেওয়ারী লিপি ওা--এর সাদৃশ্য রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণটির রূপ হল ও। বাংলা-অসমীয়া, ওড়িয়া এবং মৈথিলীতে বর্ণটির রূপ হল যথাক্রমে ও ও এবং ও নাগরীতে ओ । অর্থাৎ অ বর্ণের সঙ্গে ও-কার যুক্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যঞ্জনবর্ণঃ

ক: চর্যাগীতিকোষে বর্ণটির লিপিরূপ হল অথবা । লিপিকর সম্ভবত দুটি লিপিই কলমের এক টানে লিখেছেন; -ডাইনে থেকে বাঁয়ে মাত্রা টেনে নীচে ত্রিভুজ এঁকে ডানদিকে আক্‌শির মতো টেনে নিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণটির দুটি রূপ মেলে –প্রথম লিপিটির সঙ্গে চর্যার দুটি লিপির মিল রয়েছে। আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রিত লিপিরূপে (ক) রেখার টান সরল, কোণগুলি সুস্পষ্ট। তবে হাতের লেখা 'ক' লিপি সাধারণত কলমের একটানেই লিখিত হয়। ওড়িয়া লিপিতে মাত্রাটি অর্ধবৃত্তাকৃতি নিয়েছে। মৈথিলী 'ক' এবং নেওয়ারী লিপি বাংলা অসমীয়া লিপিরই সমর্ধমী বলা যেতে পারে। নাগরী লিপির সঙ্গে ওড়িয়া লিপির সাদৃশ্য বেশী রয়েছে। চর্যাপুথিতে ক-বর্ণের সঙ্গে 'অ' ব্যতীত অন্য কয়েকটি স্বরধ্বনির বা ব্যঞ্জনধ্বনির সংযোগে বর্ণলিপিটির কিছু আকৃতিগত পরিবর্তন লক্ষিত হয়। তার অল্প কয়েকটি নিদর্শন লিপি-তালিকায় দেওয়া গেল।

খ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটি লেখা হয়েছে অথবা রূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি থেকে এ-লিপির পার্থক্য বেশী নয়। বাংলা, অসমীয়া এবং মৈথিলীতে বর্ণটির আধুনিক মুদ্রণরূপ হল খ। ওড়িয়া এবং নাগরী-নেওয়ারী ख, ख लिपि অবশ্য বাংলা (প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক), অসমীয়া বা মৈথিলী লিপি থেকে অনেকটা পৃথক।

গ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির লিপিরূপ হল । শ্রীকৃষ্ণকীতনে এরই কাছাকাছি রূপ মিলেছে । আধুনিক বাংলা-অসমীয়াতে মুদ্রণলিপির রূপ হল গ; মৈথিলীতে ওড়িয়াতে নাগরী ও নেওয়ারীতে ग, । বলা যেতে পারে, আলোচ্য সবগুলি লিপিরই উৎস অভিন্ন।

ঘ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির লিপিরূপ হল ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে । বাংলা-অসমীয়ার আধুনিক মুদ্রণরূপ হল ঘ। মৈথিলী ও নেওয়ারীতে ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে রূপটি দাঁড়ায় , নাগরীতে घ। ওড়িয়াতে অর্ধবৃত্তাকার মাত্রাসহ লিপিরূপ হয়েছে । তবে সহজেই অনুমান করা চলে, ওড়িয়া-সহ সব ঘ-লিপি এক উৎসজাত।

ঙ: বর্ণটির পৃথক বর্ণরূপ চর্যাগীতিকোষে মিলছে না। যুক্তাক্ষর লিপিতে বর্ণটির অবশ্য বহুল ব্যবহার ঘটেছে। তার নির্দেশ পরে যথাস্থানে (২.৭) দেওয়া হয়েছে।

চ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির লিপিরূপ হল ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ; ওড়িয়াতে । বাংলা-অসমীয়াতে মুদ্রণরূপ হল চ। নাগরী ও নেওয়ারীতে च, । চর্যাগীতিতে 'চ' এবং 'ব' লিপির মধ্যে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও এই ভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ছ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির দুটি লিপিরূপ মিলেছে: এবং ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মৈথিলীতে ; ওড়িয়াতে ; নেওয়ারীতে এবং নাগরীতে । মোটামুটি ধরা যায়, এক উৎস থেকেই সব লিপিগুলি উদ্ভুত হয়েছে। তবে আধুনিক রূপ এসে অনেকটা পার্থক্য দেখা দিয়েছে। চর্যাপুথির লিপিকর ছ বর্ণ এবং চ্ছ বর্ণ যুক্তবর্ণের মধ্যে লিপিগত পার্থক্য রাখেননি। তার ফলে পাঠে বিভ্রান্তির অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে।

জ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির লিপিরূপ হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ মেলে । বাংলা-অসমীয়াতে মুদ্রণরূপ হল জ। মৈথিলী ও নেওয়ারীতে লিপিরূপ, যথাক্রমে এবং । ওড়িয়াতে নাগরীতে । বলে যেতে পারে, এখানেও সবগুলি লিপির মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্য রয়েছে।

ঝ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির লিপিরূপ হল । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ত্রিভুজ অংশটি কালিতে না ভরে লেখা হয়েছে আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণলিপিতে বর্ণটির রূপ হল, ঝ। মৈথিলীতে ত্রিভুজের একটি বাহু ঝরে গিয়ে হয়েছে ; নেওয়ারী -তে মৈথিলী জ-লিপিরই পরিবর্ধিত রূপ রক্ষিত হয়। ওড়িয়া এবং নাগরী লিপিদুটিও বাংলা-অসমীয়া লিপি থেকে স্বতন্ত্র।

ঞ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির লিপিরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আরও আধুনিক রূপ নিয়ে হয়েছে ; ক্রমে বিবর্তনে মৈথিলী এবং আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণলিপিতে এর রূপ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে এবং ঞ। ওড়িয়া, নেওয়ারী এবং নাগরী লিপিতে কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন রূপে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে । দেখা যাচ্ছে, বর্ণটির প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাংলা-অসমীয়া রূপের সঙ্গে নেওয়ারী ও মৈথিলীর যতটা মিল রয়েছে ওড়িয়া বা নাগরীর ততটা সাদৃশ্য নেই।

ট: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটি লিখিত হয়েছে । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উপরের ইলেক্ চিহ্নটি আরও স্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে -এবং আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণরূপ মিলছে ট। মৈথিলীতে একটু একটু শিল্পিত ভঙ্গিতে লেখা হয়েছে । ওড়িয়া, নেওয়ারী এবং নাগরী রূপ হল, যথাক্রমে । যেমন প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক বাংলা-অসমীয়া এবং মৈথিলী 'ট' লিপির মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি ওড়িয়া, নেওয়ারী এবং নাগরী 'ট' লিপির মধ্যেও বেশ মিল লক্ষ করা যায়।

ঠ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির দুটি রূপ মিলেছে: এবং । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে হল এবং । মৈথিলীতে যেন অনেকটা চ-বর্ণের মাথায় মাত্রা বসানো। বাংলা-অসমীয়া আধুনিক মুদ্রণরূপ হল 'ঠ'। ওড়িয়াতে চর্যাপুথির রূপটি পাওয়া যাচ্ছে। নেওয়ারীতে লিপিটি ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে ত্রিকোণাকৃতি হয়েছে । নাগরীতে তার ট

Dhaka University Institutional Repository

লিপির সামান্য পরিবর্তন করে লিখিত হয়েছে । এর সঙ্গে অন্যান্য পূর্বী ঠ-লিপির মিল খুবই সামান্য।

ড: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির রূপ হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ; মৈথিলী এবং নেওয়ারী ওড়িয়াতে নাগরীতে । বাংলা-অসমীয়া আধুনিক মুদ্রণলিপি হল, ড। ড বর্ণটি শব্দ সূচনায় না বসে অন্যত্র বসলে সাধারণত ড় ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। বাংলা-অসমীয়াতে লিপিটির উচ্চারণ-পার্থক্য বোঝাতে ড় -এর নিচে বিন্দু দিয়ে ড় লেখা হয়। চর্যার যুগে অবশ্য এই লিপিগত পার্থক্য ছিল না। অনুমান উচ্চারণ ধরে নিতে হত।

ঢ: চর্যাগীতি এই বর্ণটি ট বর্ণলিপির সঙ্গে অভিন্ন । অর্থাৎ এর লিপিরূপ হল । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কিন্তু ট লিপির ইলেক্ ছেঁটে দিয়ে এর পৃথক রূপ দাঁড়িয়েছে : আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণরূপে (ঢ) সঙ্গে এই রূপের কিছু মিল রয়েছে। ওড়িয়াতে অর্ধাবৃত্তাকার মাত্রা সহযোগে রূপ দাঁড়িয়েছে । নেওয়ারী-নাগরীতে । ড-বর্ণের মতো ঢ-বর্ণটিও শব্দ সূচনায় না বসলে সাধারণত ঢ় উচ্চারণে পঠিত হয়। বাংলা-অসমীয়াতে এই উচ্চারণগত পার্থক্য বোঝাবার জন্য বর্ণের নীচে বিন্দু চিহ্ন ব্যবহারের রীতি আধুনিক কালে প্রচলিত হয়েছে; চর্যাপুথিতে ছিল না।

ণ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির লিপিরূপ হল ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অনেকটা আধুনিক রূপ নিয়েছে । আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণরূপে হয়েছে । পুরানো মৈথিলীতে বর্ণটির রূপ ছিল ,আধুনিক পরিবর্তিত রূপ হল এবং ওড়িয়া - নেওয়ারীতে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপটি হল । নাগরীলিপিটি এই লিপিগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বাকী সবগুলি লিপির মধ্যেই সাদৃশ্য রয়েছে।

ত: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির রূপ হল ;নেওয়ারী লিপির সঙ্গে এর মিল রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপ নিয়ে হয়েছে ; আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণরূপে মাত্রাটির সংযোগরেখা লুপ্ত হয়ে ত লিপির জন্ম হয়েছে। ওড়িয়াতে আবার অর্ধ-গোলাকৃতি মাত্রা-সহযোগে হয়েছে । মৈথিলী লিপিটি বাংলা ত-এরই প্রকারভেদ মাত্র। নাগরীতে লিপিটি পৃথক রূপ নিয়ে হয়েছে ।

থ: চর্যাগীতি পুথির বর্ণটি লেখা হয়েছে রূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে এরই শিল্পিত, আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণরূপ হল থ। মৈথিলী এবং নেওয়ারী ওড়িয়া এবং নাগরী মূল লিপিটির প্রকারভেদ মাত্রা। থ বর্ণটির ক্ষেত্রে আলোচ্য সব কটি ভাষালিপির মধ্যেই বেশ সাদৃশ্য রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির দুটি লিপিরূপ রয়েছে এবং ।শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও দুটি রূপ মিলছে এবং । চর্যা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম লিপিটি আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণরূপের (দ) কাছে এসেছে । মৈথিলীতে আবার মাত্রা অনেকটা খসে গিয়ে হয়েছে । ওড়িয়াতে অর্ধবৃত্তাকার মাত্র-সহ রূপ দাঁড়িয়েছেন । নেওয়ারী ও নাগরীতে যথাক্রমে এবং । আলোচ্য বর্ণটির ক্ষেত্রেও সবকটি পূবী ভাষালিপির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয় ।

ধ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির রূপ হল অথবা ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঈষৎ বাঁকা দণ্ডরেখায় বর্ণটির লিপিরূপ দাঁড়িয়েছে । আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণ রূপটি আবার সরল দণ্ড নিয়ে হয়েছে ধ। মৈথিলী ধ চর্যালিপিরই মার্জিত রূপ। ওড়িয়াতে ত্রিভুজটি বৃত্তাকৃতি নিয়ে হয়েছে । নেওয়ারীতে চৈতনটি দীর্ঘ হয়ে দাঁড়িয়েছে তে। নাগরীতে রূপ হল ধ। এখানেও বর্ণটির সবগুলি লিপিরূপে সাদৃশ্য রয়েছে ।

ন: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির লিপিরূপ হল । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দুটি রূপ মিলছে এবং দ্বিতীয় রূপটির সঙ্গে আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণরূপের (ন) সাদৃশ্য বেশী। মৈথিলী লিপিতে বর্ণটির লিপিরূপ হল ; ওড়িয়াতে অর্ধবৃত্তাকার মাত্রাসহ বর্ণটির লিপিরূপ দাঁড়িয়েছে ; নেওয়ারী ওনাগরী রূপ, যথাক্রমে এবং । এখানেও সবগুলি পূর্বী লিপির মধ্যেই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

প: চর্যাগীতি কোষ পুথিতে বর্ণটির অন্তত তিনটি রূপ পাওয়া যায়: এবং । শেষোক্ত লিপিটির সঙ্গে পুথির য-লিপিটির বিশেষ মিল থাকার ফলে অনেক সময় পাঠে ভ্রান্তির অবকাশ সৃষ্টি করেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও বর্ণটির অন্তত তিনটি রূপ মেলে: এবং আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণরূপ হল 'প'। মৈথিলীতে বতর্মান বাংলা-অসমীয়া লিপিরই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ মিলেছে। ওড়িয়াতে বৃত্তাকৃতি নিয়ে রূপ দাঁড়িয়েছে । নেওয়ারী লিপির সঙ্গে চর্যার তৃতীয় রূপটির সাদৃশ্য রয়েছে। নাগরীতে এরই পরিবর্তিত রূপ হয়েছে।প সুতরাং আলোচ্য বর্ণের ক্ষেত্রেও সবগুলি লিপি যে একই উৎসজাত তা উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না।

ফ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির লিপিরূপ হল । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে হয়েছে ; 'ফ' এর আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণরূপ থেকে ধরা যায়, উক্ত দুটি লিপির বিবর্তন পথেই পরিশীলিত বর্তমান রূপটির উদ্ভব ঘটেছে । মৈথিলী বা নেওয়ারী চর্যা-লিপিরই হেরফের মাত্র । ওড়িয়াতে প লিপির ডানদিকে বিন্দু সংযোগে রূপ হয়েছে । নাগরীতেও প লিপির ডানদিকে পুচ্ছ টেনে হয়েছে । ফ-লিপির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে , চর্যার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের, আধুনিক বাংলা-অসমীয়া, মৈথিল্য এবং নেওয়ারীর মিল রয়েছে। ওড়িয়া এবং নাগরীতে রূপ স্বতন্ত্র ; তাদের প-লিপিরই পরিবর্ধিত রূপ সেখানে প্রকাশ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ব: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির দুরকম লিপি মিলছে : এবং । দ্বিতীয় রূপটির সঙ্গে চর্যাপুথির 'চ' লিপির মিল থাকার ফলে পাঠে ভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপির ক্ষেত্রে চর্যার প্রথম লিপিরই বিবর্তন লক্ষিত হয়। আধুনিক বাংলা- অসমীয়া মুদ্রণ রূপে (ব) এরই সরল রেখায়িত ত্রিকোণবিশিষ্ট রূপটি পাওয়া যাবে। মৈথিলী লিপির সঙ্গে চর্যাপুথির প্রথম লিপির সাদৃশ্য রয়েছে । ওড়িয়াতে বৃত্তাকৃতি পেয়ে হয়েছে । নাগরীতে বর্গীয় 'ব' বোঝাতে এবং অন্তঃস্থ 'ব' বোঝাতে লিপির ব্যবহার হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে-সংস্কৃত, মধ্যযুগের পালি-প্রাকৃতে বা পশ্চিমী অপভ্রংশে বর্গীয় এবং অন্তঃস্থ 'ব' এর উচ্চারণগত পার্থকের জন্যে লিপিগত পার্থক্য রাখা হয়েছে পূর্বী অপভ্রংশ, বাংলা, অসমীয়া, মৈথিলী এবং ওড়িয়াতে এই দুই বর্ণের উচচারণে তেমন কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয় না । সেই কারণেই লিপিগত পার্থকোর প্রয়োজনও অনুভূত হয়নি। মৈথিলী ওঅসমীয়াতে লিপিগত পার্থক্যে স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা দু- এক জন ভাষাবিদ ও লেখক এখন অনুভব করছেন।

ভ: চর্যাগীতি কোষে বর্ণটির রূপ হল । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নিম্নাংশটি ঈষৎ পরিবর্ধিত হয়ে হয়েছে । বর্তমান বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণরূপ হল ভ। মৈথিলী দুটি রূপ পাওয়া যাচ্ছে এবং । দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে প্রথম লিপিটির সুপ্রচলিত। ওড়িয়াতে লিপিটির রূপ অর্ধবৃত্তাকার মাত্রা সহ দাঁড়িয়েছে । নেওয়ারী এবং নাগরী লিপিদুটি পরস্পর স্বতন্ত্র এবং পূর্বোক্ত লিপিগুলি থেকেও সর্ম্পূণভাবে পৃথক।

ম: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির রূপ হল । বোধ হয় কলমের এক টানে মাত্রা সমেত বর্ণটি লেখা হত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নিম্নাংশটি অনেকটা আধুনিক রূপ নিয়ে হয়েছে । আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণরূপ হল ম। মৈথিলীতে অনেকটা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাধর্ম্যে লিখিত হয়েছে । নেওয়ারী এবং নাগরী এর মধ্যে পার্থক্যে খুবই কম রয়েছে। ওড়িয়াতে অর্ধবৃত্ত মাত্রা সহকারে লেখা হয়েছে । আলোচ্য বর্ণটির ক্ষেত্রেও দেখা গেল কয়টি ভাষালিপির মধ্যেই আকারগত মিল রয়েছে।

য: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির রূপ হল অথবা ; প্রথম লিপিটির পাঠের সঙ্গে অনেক সময়ই চর্যার 'প' লিপির পাঠে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতেও প্রায় একই আদর্শে লিখিত হয়েছে । আধুনিক বাংলা অসমীয়া মুদ্রণরূটিতে (য) এরই পরিশীলিত নিদর্শন পাওয়া যাবে। মৈথিলী নেওয়ারী এবং নাগরী মূল একই লিপির প্রকারভেদ মাত্র। ওড়িয়া লিপিটিকে 'প' লিপির পরিবর্ধিত রূপান্তর বলা যেতে পারে। চর্যাতে অন্তঃস্থ য- এর উচ্চারণ সম্ভবত বগীয় জ এর কাছে চলে এসেছিল। সে কারণে বানানে 'য' এবং জ-এর শিথিল প্রয়োগ লক্ষিত হয়। শব্দন্ত ও শব্দমধ্য 'য' এবং 'জ' এর উচ্চারণে এই বিকৃতি আসেনি। এই উভয় উচ্চারণের তারতম্য বোঝাতে আধুনিক বাংলা-

Dhaka University Institutional Repository

অসমীয়াতে বর্ণটির নীচে বিন্দু সংযোগ করে 'য়' বর্ণলিপির সাহায্যে 'ইয়' উচ্চারণ বোঝানো হয়ে থাকে।

র: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির রূপ পাওয়া যাচ্ছে ; অর্থাৎ ত্রিকোণটি সম্পূর্ণ বা আংশিক মসীলিপ্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণটির রূপ হল । মধ্য বাংলায়, অসমীয়া এবং মৈথিলীতে এই ত্রিকোণের মধ্যে রেখাঙ্কিত 'র' বর্ণের প্রচলন করা যায়। আধুনিক বাংলায় অবশ্য ওই রেখা লুপ্ত হয়ে ব-এর নীচে বিন্দুযুক্ত র-এর প্রচলন হয়েছে। ওড়িয়া কে ওড়িয়া চ-বর্ণেরই বর্ধিত রূপ বলা যেতে পারে- এর সঙ্গে বাংলা, অসমীয়া ও মৈথিলী র-এর কোনই মিল নেই। নেওয়ারী এবং নাগরী লিপি দুটিও বাংলা-অসমীয়া-মৈথিলী ধারার বহির্ভূত বলেই হয়।

ল: চর্যাগীতিকোষে বর্ণটির দুটি রূপ মিলছে এবং । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও দুটি রূপ রয়েছে এবং । আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণলিপিতে (ল) দ্বিতীয় লিপিরই পরিবর্তিত, শিল্পিত রূপ পাওয়া যায়। মৈথিলী লিপিতে আবার চর্যা-শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রথম লিপিটির বিবর্তন লক্ষিত হয়। অর্ধবৃত্ত মাত্রাসহ ওড়িয়া নেওয়ারী এবং নাগরী লিপিগুলির সঙ্গে-শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্বিতীয় লিপিটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

শ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির লিপিরূপ হল ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে । আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণরূপে (শ) এরই পরিবর্তিত আকার দেখা দিয়েছে। ওড়িয়াতে বর্ণটির রূপ হয়েছে । মৈথিলী বাংলারই সাদৃশ্যসূচক নেওয়ারীতে আবার একটি গোলক ঝরে গিয়ে হয়েছে । নাগরী এই ধারা থেকে যেন কিছুটা পৃথক রয়েছে।

ষ: চর্যাপুথিতে বর্ণটির লিপিরূপ হল ; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ নিয়ে হয়েছে ; আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণরূপে (ষ) এরই পরিশীলিত চেহারাটি ধরা পড়েছে। কৌণিক অংশগুলি বৃত্তাকৃতি নিয়ে ওড়িয়া লিপিতে বর্ণটির রূপ দাঁড়িয়েছে । নেওয়ারী এবং নাগরী লিপিতে যথাক্রমে এবং । আলোচ্য বর্ণটির ক্ষেত্রে সবকটি ভাষালিপির মধ্যেই যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

স: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির দুটি রূপ রয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে লিপিতে এই দ্বিতীয় রূপের আদর্শ মিলছে। অনুচ্ছেদ-সূচনায় প্রদত্ত 'স' লিপিতে এর পরিমার্জিত আধুনিক বাংলা-অসমীয়া মুদ্রণ রূপটি পাওয়া যাচ্ছে। মৈথিলী লিপিও একই আদর্শে লিখিত। ওড়িয়াতে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে , নেওয়ারী ও নাগরী লিপিতে স, স।।কমাত্র ওড়িয়া এবং নেওয়ারী-নাগরিতে অল্প কিছুটা পার্থক্য ঘটলেও তিন স্তরের বাংলা, অসমীয়া এবং মৈথিল্য লিপি মূলত একই রূপের রকমফের মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

হ: চর্যাগীতি পুথিতে বর্ণটির লিপিরূপ হল ; এরই পরিবর্তিত মৈথিলীরূপ হল যথাক্রমে এবং । শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিতে রূপটি অনেকটা আধুনিক বাংলা-অসমীয়া হ-লিপির কাছে চলে এসেছে। ওড়িয়াতে লিপিটি কিছুটা জটিল রূপ নিয়ে হয়েছে । চর্যালিপির সঙ্গে এখানে মৈথিলী, নেওয়ারী ও নাগরী লিপির মিল বেশী দেখা যাচ্ছে। আধুনিক বাংলা-অসমীয়াতে হ- লিপিতে শুঁড়টি ডান থেকে বাঁদিকে ঘুরে গেছে। ওড়িয়াতে দিক পরিবর্তিত না ঘটলেও রেখায় জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।"[৪১]

ড. এস. এম লুৎফর রহ্মান চর্যাপদের পুথি পর্যবেক্ষণ শেষে এ পুথির লিপি বিচার করে বলেছেন, " বস্তুতঃ অক্ষরের ছাঁদের বিবেচনায়- স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে কৃষ্ণকীর্তনের বাঙ্লা লিপির সঙ্গে তুলনায় আলোচ্য পুথির উ, ঊ এবং এ– এই তিনটি বর্ণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মৈথিলীর সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে অ, আ, এবং এ–এই ত্রিবর্ণের। কিন্তু নেওয়ারীর কোন সাদৃশ্য নেই। উড়িয়া লিপির সঙ্গে সাদৃশ্য মাত্র একটির। সেটিও আধুনিক অসমীয়ার সঙ্গে এর সাদৃশ্য এই অক্ষরেই। পক্ষান্তরে ,ব্যঞ্জন বর্ণের ক্ষেত্রে কৃষ্ণকীর্তনের পুথির লিপির সঙ্গে আলোচ্য পুথির লিপির সাদৃশ্য দেখা যায়– ক,খ,গ,ঘ,চ,ঝ,ঞ,ড,ধ,ব,ম,স,ল,শ,ষ,স, এই ষোলটি বর্ণের। অপিচ দ,ন,প,ও,০(অনুস্বার) বর্ণ গুলো কৃষ্ণকীর্তন অপেক্ষা অধিকতর বাঙ্লা অক্ষর রূপে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ফ, ভ, ব (র) ভ ও হ এর কোন মিল নেই। সংযুক্ত ক্ষ, ঙ্ক ও ক্র এই তিনটি যুক্ত বর্ণের মধ্যে কৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপির সঙ্গে সাযূজ্য রয়েছে; শেষোক্ত দু' টির প্রথমটির নয়। মৈথিলী ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে আলোচ্য পুথির ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে চ, ঙ, ড, ম, থ ও হ এর সাযূজ্য বিদ্যমান। তাছাড়া ক, খ, গ, ঘ, জ, ট, ড, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, শ, ষ, স অধিকতর স্পষ্ট এবং আধুনিক বাঙ্লা লিপির অনুরূপ পক্ষান্তরে মৈথিলী ছ, ঝ, ঠ, ড, ব, ভ, হ এবং অনুস্বার স্বতন্ত্র। মৈথিলী যুক্তাক্ষর ঙ্ক এবং ক্র-র সাথেও আলোচ্য পাণ্ডুলিপির ঐ দুটি যুক্তবর্ণের মিল রয়েছে। নেওয়ারীর সঙ্গে সত্যিকারে এই পাণ্ডুলিপির কোন বর্ণের-ই মিল নেই। উড়িয়ার সঙ্গেও নয়। দেবনাগরী লিপির সঙ্গে চর্যা পুথির ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে একমাত্র 'হ' ভিন্ন অন্য বর্ণের মিল নেই।" [৪২]

ড. এস. এম. লুৎফর রহ্মান আরো বলেছেন, "এভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই পুথির বাঙ্লা লিপির অধিকাংশ তখনও যথেষ্ট বাঙ্লা আকার ধারণ করেনি। বিশেষ করে অ, আ, ই, ঈ, ও চ, ছ, জ, ট, ঠ, ড, ণ, ত, থ, ভ, হ, ও ক্ষ বর্ণসমূহ। এগুলোর কোন কোন টি যেমনঃ চ, জ, ণ, ল, এবং হ যথাযথ রূপ লাভ " শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকালকেও অতিক্রম করে।" [৪৩]

---

৪১. নীলরতন সেন। পূর্বোক্ত, পৃ. ২১-২৬।
৪২. ড. এস.এম. লুৎফর রহ্মান। পূর্বোক্ত,পৃ.৬১।
৪৩. ড. এস.এম. লুৎফর রহ্মান। পূর্বোক্ত,পৃ.৬২-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

চর্যাপদের লিপি-বৈচিত্র্য

চর্যাপদের লিপি-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে ড. এস. এম. লুৎফর রহ্মান লিখেছেন, " অতি প্রাচীন এই পাণ্ডুলিপির লেখন-রীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, বেশ মোটা ধাতব নিব দিয়ে উজ্জল কালো কালিতে সমস্ত পুথি লেখা হয় ব'লে ধারণা করা চলে। কিন্তু পুথিটির সর্বত্র এক-ই রকম উজ্জ্বল কালি ব্যবহৃত হয়নি"।[৪৪]

তাছাড়া চর্যাপদের পুথি একই হাতের লেখা কিনা ,সে বিষয়ে ও সন্দেহ রয়েছে । এ প্রসঙ্গে নীলরতন সেন লিখেছেন, " সমগ্র পুথিটি এক-ই হাতে লেখা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ র'য়েছে। এক-ই বর্ণ বা অ-কার, ই-কার ইত্যাদি একাধিক ভঙ্গিতে লিখিতে হয়েছে। ..... অক্ষর লিপিতে ক্বচিৎ কখনো অযত্নের ছাপ মিললেও অধিকাংশ পৃষ্ঠায় বেশ যত্ন রচিত লিপির নিদর্শন মেলে। কয়েকটি পৃষ্ঠায় বর্ণগুলির ছাঁদ সোজা, তবে অধিকাংশ পৃষ্ঠাতে এই ছাঁদ বাঁ দিকে সামান্য হেলানো"।[৪৫]

চর্যাপদের পুথির লিপি-বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে ড. রহ্মান আরো লিখেছেন,"পুথিটির প্রত্যেকটি পাতার উভয় পৃষ্ঠাতেই লেখা হ'য়েছে। প্রতি পৃষ্ঠায় পাঁচ পংক্তির সন্নিবেশ। প্রথম ও পঞ্চম পংক্তির তালপাতা উভয় পার্শে এক এক ইঞ্চি বাদ রেখে লম্বা লাইন টেনে লেখা। মাঝের তিন পংক্তি প্রতি পৃষ্ঠার মধ্যভাগে এক ইঞ্চি ফাঁক রেখে উভয় দিকে বিস্তৃত। এই ফাঁকের মধ্যেস্থানে ছিদ্র। তার মধ্যে সুতো ঢুকিয়ে তালপাতাগুলো একসঙ্গে বেঁধে রাখার জন্য এই ছিদ্র-স্থান অপরিহার্য্য। সুতোর ঘষায় মাঝের কিছু কিছু লেখা বিনষ্ট হ'য়েছে। এছাড়া পুথি লেখনের অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, আধুনিক কালে একটি দীর্ঘ পংক্তিতে যত শব্দ ধরে তার সব-ই যেমন, প্রতি শব্দের তার ফাঁক রেখে স্বতন্ত্র ভাবে লেখা হয়।

সে কালে তেমনটি করা হতো না। ..... ফলে, আলোচ্য পুথির লিপিকর প্রায় দশ ইঞ্চি দীর্ঘ এক একটি পংক্তিতে যত শব্দ ধরে তা সব-ই একটানে লিখে গেছেন, কোথাও দুই শব্দের মাঝে ফাঁক দেননি"।[৪৬]

অবশ্য ড. এস. এম. লুৎফর রহ্মান তাঁর রচিত 'বৌদ্ধ চর্যাপদে' যে অভিমত দিয়েছিলেন, সে মত পরিবর্তন করেন। তিনি পরবর্তীকালে 'বাঙালা লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস'-গ্রন্থে বলেছেন, 'চর্যাপদের লিপি মূলত ঃ অঙ্গদেশের অঙ্গলিপি; বঙ্গদেশের "বঙ্গলিপি" নয়। এই অঙ্গদেশ বর্তমান ভারতের ভাগলপুর প্রদেশ ও তার নিকটবর্তী এলাকা। তবে এই লিপির প্রভাব বা এর প্রচলন বীরভূম- বর্ধমান এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকতে পারে'।[৪৭]

---

৪৪. ড. এস.এম. লুৎফর রহ্মান। বৌদ্ধ চর্যাপদ, পূর্বোক্ত,পৃ. ৬২ ।

৪৫. উদ্ধৃত। ড. এস.এম. লুৎফর রহ্মান। বৌদ্ধ চর্যাপদ, (ধারণী সাহিত্য সংসদ, ঢাকা- ১৯৯০) পৃ. ৬২।

৪৬. ড. এস.এম. লুৎফর রহ্মান। পূর্বোক্ত,পৃ. ৬২-৬৩।

৪৭. ড. এস.এম. লুৎফর রহ্মান। বাঙালালিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস। (বাংলা একাডেমী থেকে শীঘ্রই প্রকাশিতব্য) পৃ.১-১৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, চর্যাপদের লিপি নাম-চারিত্র্য এখনো বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। নিম্নে চর্যাপদের একটি পৃষ্ঠার নমুনা ও তার পাঠোদ্ধার দেওয়া হলো–

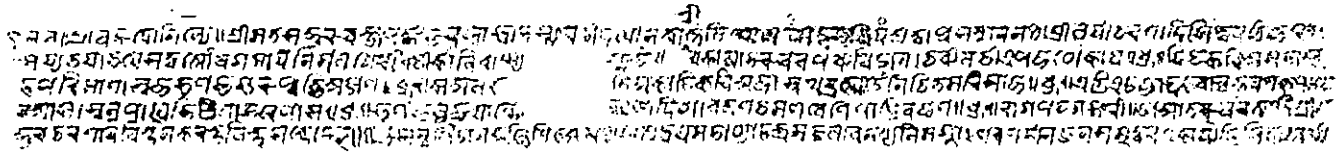

" [৪৮]

"

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চী এ পইঠো কাল ॥ ধ্রু ॥
দিড় করিঅ মহাসুখ পরিমান।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ॥ ধ্রু ॥

সঅল [সমা] হিঅ কাহি করিঅই
সুখে দুখেতেঁ নিচিত মরিআই॥ ধ্রু ॥
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণকপাটের আস।

সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহুরে পাস ॥ ধ্রু ॥
ভণই লুই আহ্মে সাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পাড়ি বইণ ॥ ধ্রু ॥

" [৪৯]

৪৮. নীলরতন সেন। চর্যাগীতি কোষ। পূর্বোক্ত, পৃ.-২।
৪৯.নীলরতন সেন। চর্যাগীতি কোষ। পূর্বোক্ত, পৃ.-২।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক যুগের শিলা লেখে বাংলা লিপির ব্যবহার ও বৈচিত্র্য

ঐতিহাসিক যুগে বাংলা দেশে বাংলা লিপির ব্যবহারের যে নমুনা পাওয়া যায়– কতিপয় শিলালেখে, দানপত্র, মুদ্রা এবং হস্তলিখিত পুস্তকে বিদ্যমান । ঐতিহাসিক আমলে বিশেষতঃ নারায়ণ পাল দেবের সময় থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়– নারায়ণ পাল দেবের বাদাল স্তম্ভ লিপি সম্পর্কে লিপিতাত্ত্বিক হীরাচাঁদ ওঝা বলেছেন, এ লিপি দশম শতাব্দীর। কিন্তু ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার ও ড. রামেশ্বর শ- এর মতে এর লিপিকাল নবম শতাব্দী। নিম্নে নারায়ণ পাল বাদাল স্তম্ভের লেখ ও বিজয় সেনের দেওপাড়া লেখ থেকে প্রস্তুত লিপিপত্রের নমুনা এবং লিপিপত্রের মূল পঙ্‌ক্তিগুলোর ফটোকপি উপস্থাপন করে তখনকার বাংলা লিপির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হলো ॥

Dhaka University Institutional Repository

(খৃষ্টীয় দশম এবং একাদশ শতাব্দী)

রাজা নারায়ণ পালের সময়ের মুঙ্গের লেখমালা থেকে মুখ্য মুখ্য অক্ষর (খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী)

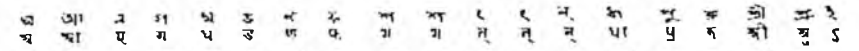

রাজা বিজয়সেনের সময়ের দেওপাড়া লেখমালা থেকে (খৃঃ একাদশ শতাব্দী)

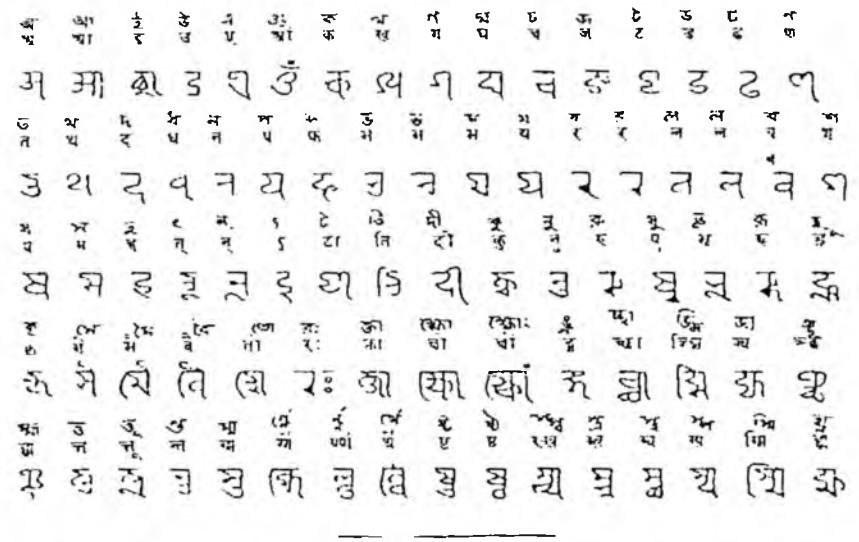

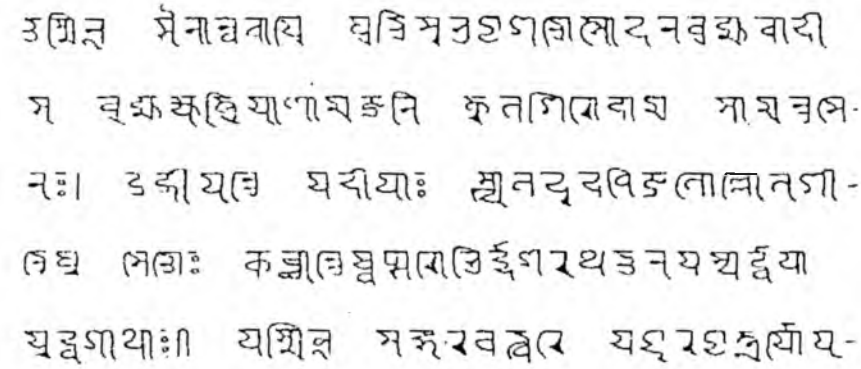

৫০. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। পূর্বোক্ত, পৃ. পরিশিষ্ট Plate XXXII থেকে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

" তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভট শতোৎসাধন ব্র(ব্র) ক্ষবাদী
স ব্র (ব্র) ক্ষক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসে-
নঃ । উদগীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধি জলোল্লোলশী-
তেষু সেতোঃ কচ্ছান্তেষুল্লরোভির্দ্দশরথখনয়স্পর্দ্ধয়া
যুদ্ধগাথাঃ ॥ যস্মিন্ সঙ্গরচত্বরে পটুরটত্তুর্য্যোপ- ।"[৫১]

উক্ত লিপিপত্রের লিপি সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায়, "বাদাল স্তম্ভের লেখ মধ্যে 'অ' এবং 'আ' বর্ণ দ্বয়ে প্রারম্ভিক ক্ষুদ্র রেখা না দেওয়ায় তা নাগরীর 'ঞ' এর মত হয়ে গিয়েছে। মনে করা হয় খোদাইকরের ত্রুটির ফলেই ও রকম হয়েছে। দেও পাড়ার লেখ-মধ্যে অবগ্রহের (লুপ্ত আকারের) আকৃতি নাগরীর হ্রস্ব - ই কারের ন্যায় হয়েছে। বিসর্গের উপরেও শির-চিহ্নের আড়রেখা দেয়া হয়েছে। 'প' এবং 'য' এর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তা ছাড়া বর্গীয় 'ব' এবং অন্তস্ত 'ব' এর মধ্যে কোন প্রকার লিপিভেদ নেই ॥"[৫২]

রাজা নারায়ণ পাল দেবের ও বিজয় সেনের দেওপাড়া লেখ থেকে প্রস্তুত লিপিপত্রের ভাষা সংস্কৃত কিন্তু হরফ বাংলা।

বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপির আলোচনা

বিজয় সেনের দেওপাড়া শিলালেখ G.T. Metcalfe কর্তৃক ১৮৬৫ সালে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি পুলিশ স্টেশনের নিকট দেওপাড়া গ্রামে আবিস্কৃত হয়। দেওপাড়া রাজশাহী শহর থেকে সাত মাইল পশ্চিমে এবং তার অদূরে গোদাগাড়ি। এ শিলালেখটি প্রথমে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' – এ প্রকাশিত হয় এবং পরে সম্পাদিত হয়ে অন্যত্র স্থান লাভ করে। এ সম্পর্কে জনাব ননী গোপাল মজুমদার তাঁর 'Deopara Inscription Of Vijayasena' প্রবন্ধে বলেন, "The inscription was first published by Metcalfe in the journal of the Asiatic Society of Bengal vol. XXXIV, part-1, pp-128-54, and afterwards critically edited by Prof. Kielhorn in the Epigraphica Indica vol-1, pp-305-15 and facsimile. A fresh edition is now attempted from a set of inked estampages taken from the original stone deposited in the Indian Museum, Calcutta."[৫৩]

---

৫১. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৩।

৫২. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৩।

৫৩. Nani Gopal Majumder. Inscription of Bengal, volume III (1st The varaendra Reserch society –1929) page. 42.

Dhaka University Institutional Repository

যে পাথরটিতে খোদাই করা হয়েছিলো তার পরিমাপ ও খোদাইকারী সম্পর্কে বলা হয়েছে –

"The inscription consists of 32 lines of unifrom length. the stone on which it is engraved measures 3' 2" by 1' 9$\frac{3}{4}$" . While the inscribed surface measures 2' 7$\frac{3}{4}$" by 1' 5$\frac{1}{2}$".The engraver has done his work most beautifully and with great care. The inscription is an excellent state of preservation." [৫৪]

বাংলা অনুবাদ :

'একই রূপ দৈর্ঘ্য ৩২টি লাইন নিয়ে উৎকীর্ণ শিলা লিপি গঠিত হয়েছিল । যে পাথরের উপর শিলালিপিটি খোদাই করা হয়েছিল তার দৈর্ঘ্য ছিল ৩'/২" এবং ২"৯$\frac{৩}{৪}$"প্রস্থ ছিল। উৎকীর্ণ লিপির পৃষ্ঠদেশ ছিল । খোদাই কারী খুবই সুন্দরভাবে এবং যত্নের সাথে তার কাজটি সম্পন্ন করেছিল । উৎকীর্ণ শিলালিপির মর্যাদা খুবই সুন্দর ভাবে রক্ষিত হয়েছিল ।'

নিম্নে লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘী দানপত্র এবং কামরূপের রাজা বৈদ্যদেবের দানপত্র থেকে প্রস্তুত লিপিপত্রের নমুনা এবং লিপিপত্রের মূল পঙ্‌ক্তিগুলোর পাঠোদ্ধার দেওয়া হলো।

৫৪. Nani Gopal Majumder. পূর্বোক্ত, পৃ.৪৩-৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। পূর্বোক্ত,পরিশিষ্ট পৃ. XXIII. প্লেট থেকে উদ্ধৃত

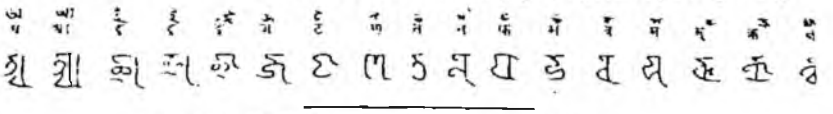

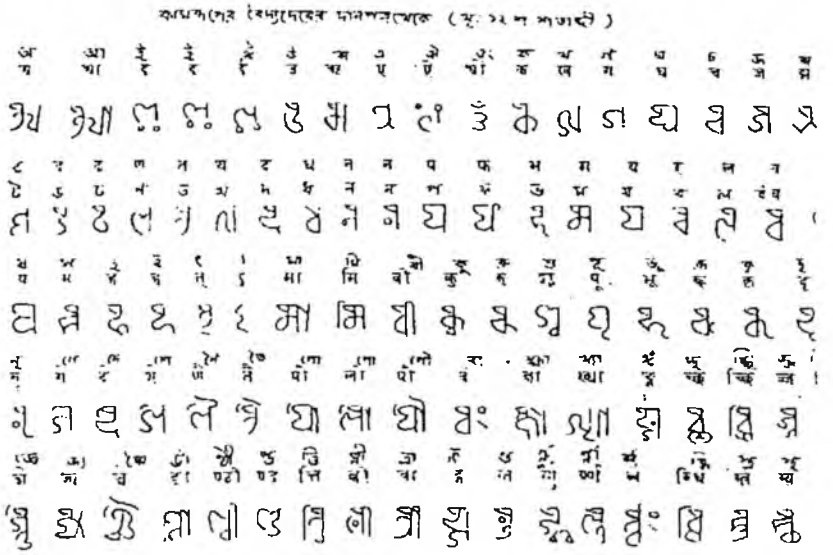

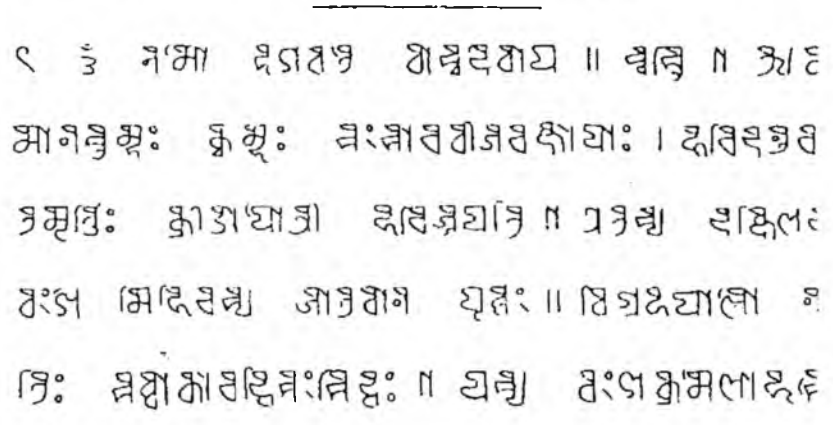

Dhaka University Institutional Repository

"ওং ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥ স্বস্তি॥ অম্ব (ম্ব) র-
মানস্তম্ভঃ কুম্ভৎ সংসার বী (বী) জরাক্ষায়াঃ হরিদন্তরমি-
তমূর্ত্তিঃ ক্রীড়াপোত্রী হরিজ্জ (র্জ্জ)য়তি॥ এতস্য দক্ষিণদুশো
বংশে মিহিরস্য জাতবান (ন্) পূব্বং (র্ব্বং)॥ বিগ্রহপালো নৃপ-
তিঃ সব্বা (র্ব্ব) কারদ্ধি (র্দ্ধি) সংসিদ্ধঃ॥ যস্য বংশক্রমেণাভূৎ সচি॥" [৫৬]

লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘীর দানপত্র ও কামরূপের রাজা বৈদ্যদেবের দানপত্র থেকে প্রস্তুত লিপিপত্রের ভাষা সংস্কৃত কিন্তু লিপি বাংলা।

লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘীর দানপত্র ও কামরূপের রাজা বৈদ্যদেবের দানপত্র থেকে প্রস্তুত লিপিপত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়– "এ উভয় লেখ-মধ্যে হ্রস্ব ই এবং দীর্ঘ -ঈ কারের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। বৈদ্যদেবের দানপত্রে এ বর্ণ থেকে ঈ কার তৈরি হয়নি, হয়েছে হ্রস্ব ইকারের কিঞ্চিত পরিবর্তন সাধন দ্বারা। অনুস্বার সংশ্লিষ্ট বর্ণের উপরের দিকে নয়, কিন্তু সামনে দেওয়া হয়েছে এবং বিন্দুর নীচে হসন্ত চিহ্নের ন্যায় একটি তেরছা রেখাও দেয়া হয়েছে। {যা বর্তমান কালেও বাংলা লিপিতে নির্বিশেষে ব্যবহৃত হচ্ছে} ব্যঞ্জন সংযোগী দীর্ঘ ঊ এবং ঋ কারের লিপি সঙ্কেতে তেমন কোন পার্থক্য নেই। বর্গীয় এবং অন্তস্ত ব-এর কোন লিপিভেদ নেই। আর,শিরাংশে সরল রেখা নেই, (যাকে বাঙলায় মাত্রা বলা হয়) সেক্ষেত্রে < এ প্রকার চিহ্ন দেওয়া হয়েছে যার ব্যাপক প্রচলন উড়িয়া ভাষায় লিপিতে পাওয়া যায়।" [৫৭]

---

৫৬. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।
৫৭. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে আসামে প্রাপ্ত বল্লভেন্দ্রের দানপত্র এবং হস্তলিখিত পুস্তক থেকে প্রস্তুত লিপিপত্রের নমুনা এবং লিপিপত্রের মূল পঙ্‌ক্তিগুলোর ফটোকপি উপস্থাপন করে তার পাঠোদ্ধার দেওয়া হলো–

৫৮. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। পূর্বোক্ত,পরিশিষ্ট পৃ. XXIV. প্লেট থেকে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

"ওং ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ যদগণ্ডমণ্ডলত-
টী প্রকটালিমালা বর্ণ্নাবলীব খদলে খলু মঙ্গ-
লস্য। লম্বো (ম্বো) দরঃ স জগতাং যশসাং প্রসার মান
ন্দতাং দ্যুমণিনা সহ যাবদিন্দুঃ ॥ পাতাল পল্বল-
তলাদ্দিবমুৎপতিষ্ণোব্বিফোঃ পুনাতু কৃতঘৃষ্টিতনোস্তনু-"। [৫৯]

আসামে প্রাপ্ত বল্লভেন্দ্রের উক্ত দানপত্র এবং হস্তলিখিত পুস্তক থেকে প্রস্তুত লিপিপত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়," বল্লভেন্দ্রের দানপত্রের কোন কোন 'ন' এবং 'ণ' বর্ণের আর 'প' ও 'য' বর্ণের স্পষ্ট প্রভেদ নেই। উভয় 'ব' বর্ণের কোন লিপি ভেদ নেই। চলতি কলামে বিসর্গের বিন্দুদ্বয় লিখে একত্র করা হয়েছে"। [৬০]

এ প্রস্তুত লিপিপত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এর ভাষা সংস্কৃত কিন্তু হরফ বাংলা।

৫৯. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।
৬০. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে হস্রোকোল প্রাপ্ত বৌদ্ধতান্ত্রিক শিলালেখ এবং উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেবের দানপত্র থেকে প্রস্তুত লিপিপত্রের নমুনা এবং লিপিপত্রের মূল পঙক্তিগুলোর ফটোকপি উপস্থাপন করা হলো। এরপর পাঠোদ্ধার দেওয়া হলো।

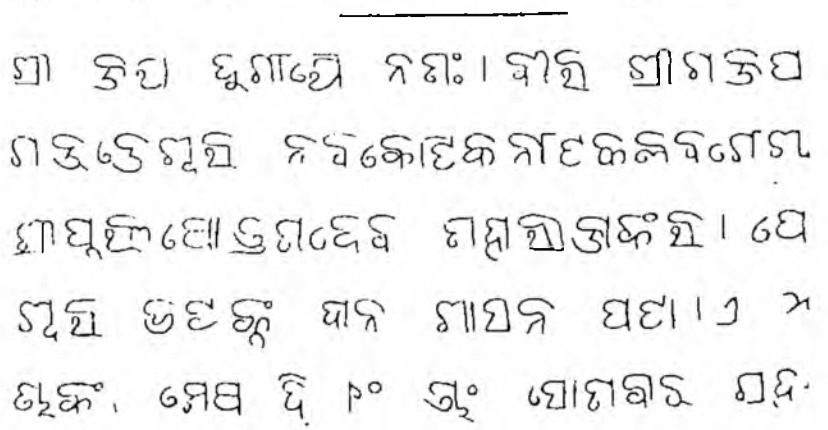

৬১. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। পূর্বোক্ত,পরিশিষ্ট পৃ. XXXV. প্লেট থেকে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

"শ্রীজয়দুর্গায়ৈ নমঃ। বীর শ্রী গজপতি
গউড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাটকলবর্গেশ্বর
শ্রীপুরুষোত্তমদেব মহারাজাঙ্কর। পোতে-
শ্বর ভটঙ্কু দান শাসন পটা। এ ৫
অঙ্ক মেষ দি ১০ অং সোমবার গ্রহণ-"।

আসামের হস্রাকোলে প্রাপ্ত উক্ত বৌদ্ধতান্ত্রিক শিলালেখ ও উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেবের দানপত্র থেকে প্রস্তুত লিপিপত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়–

"হস্রাকোল এর লেখ মধ্যে প্রত্যেক বর্ণের উপরে অনুস্বার লাগিয়ে পূর্ণ বর্ণমালার বীজমন্ত্র প্রস্তুত করা হয়েছে, যার অনুস্বার বাদ দিলে প্রকৃত অক্ষর মালা পাওয়া যায়। পুরুষোত্তম দেবের দান পত্রে অক্ষরের অধিকাংশের শিরোভাগে ৭এ রকম মাত্রা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখিত বৌদ্ধদেবের দান পত্রেও ও রকম শিরোমাত্রা দেখা যায় বর্তমান উড়িয়া লিপির অক্ষরে শিরোরেখা পরুষোত্তম দেবের দান পত্রের শিরোরেখার চেয়েও অধিক মোড়ান এবং তার প্রান্ত ভাগ অধিক নিচু তবে তা উল্লেখিত দান পত্রের শিরোরেখারই বিকশিত রূপ বটে।"[৬৩]

এ প্রস্তুত লিপিপত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় এর ভাষা সংস্কৃত কিন্তু হরফ বাংলা।

মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রাপ্ত শিলালেখ

ঐতিহাসিক যুগে শিলালিপিতে বাংলালিপির আরো একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতীয় বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে রাঢ় অঞ্চলে একটি কালো পাথরের স্তম্ভমূলে; যা মানবাকৃতির এবং পল্লবগুচ্ছের নকশা দ্বারা উঁচু নিচু ভাবে খোদিত হয়েছিল। নিম্নে শিলালিপিটির আলোকচিত্র উপস্থাপন করে তার পাঠোদ্ধার দেওয়া হলো–

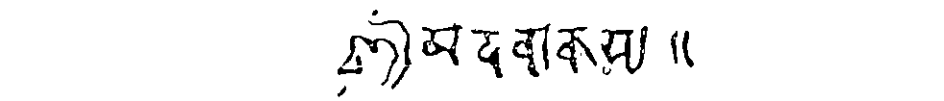

(শ্রী মদবাকস্য)[৬৪]

শিললিপির আবিষ্কারঃ ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক যখন গভীর ভাবে অনুসন্ধানী তৎপরতা শুরু হয়েছিল সে সময় শিলালিপিটি মুর্শিদাবাদ জেলার 'ভাঙ্গা মিল্কি' নামক গ্রামের খোলা মাঠে একটি বট গাছের নিচে আবিস্কৃত হয়েছিল।

---

৬২. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

৬৩. গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫।

৬৪. Sudhir Ranjan Das. Archaeological Discoveries From Mursidabad. District (West Bengal),part-One (1st , The Asiatic Society, Calcutta-1971) Page-39.

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে Sudhir Ranjan Das তাঁর 'Discovery Of An Inscriped Fragmentary Stone Pedestal' প্রবন্ধে বলেন–

"The present stone pedestal was found partially imbedded along with many other fragmentary carved stones under a banyan tree in the open field, near the village Bhanga Milky (Mursidabad)." [৬৫]

শিলালিপির আলোচনা

শিলালিপিটির সঠিক কোন লিপিকাল পাওয়া যায় নি; এবং শিলালিপির গায়ে উৎকীর্ণ 'শ্রী মদবাকস্য' কোনো একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা কৃতিত্বের অধিকারী কোনো নাম হতে পারে। তবে এ শিলালিপির নিদর্শন থেকে সহজেই বোঝা যায়, শিলালিপিটি দশম-একাদশ শতকে উৎকীর্ণ। এ শিলালিপি সম্পর্কে বলা হয়েছে– "The inscription from left to right ends with two vertical strokes and it reads : Srimadva kasya i.e, of srimadvaka, perhaps the deity belonged to the prosperous or glorious VAKA (A personal name). The letters of the inscription are in characters of C. tenth–eleventh century. A. D."[৬৬]

বাংলা অনুবাদ ঃ

উৎকীর্ণ শিলালিপি বাম দিকে লেখা হয়ে ডান দিকে শেষ হয়েছিল এবং যা লম্বালম্বিভাবে দুই খণ্ডে বিভক্ত । এর পাঠ হলো , শ্রীমদবাকস্য বা শ্রীমদবাকা । সম্ভবত লেখটি কোন ধনী বা গৌরবান্বিত ব্যক্তির ঐতিহ্য বহন করছে । উৎকীর্ণ শিলালিপিতে খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

পরিশেষে এ শিলালিপি সম্পর্কে বলা যায়, "There are only a few inscriped images from Bengal and the discovery of the present example is indeed an important addition."[৬৭]

বাংলা অনুবাদ ;

খুব কম সংখ্যক উৎকীর্ণ লিপিচিত্র বাংলাতে পাওয়া গেছে, এবং আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বর্তমান উদাহরণটি নিশ্চয়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ।

---

৬৫. Sudhir Ranjan Das. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯।
৬৬. Sudhir Ranjan Das. পূর্বোক্ত,পৃ. ৪০।
৬৭. Sudhir Ranjan Das. পূর্বোক্ত,পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত শিলালেখ

ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত অভিলেখ টি 'Bhuvanesvar inscription of Bhatta-Bhavadeva' নামে পরিচিত। এই অভিলেখটির আবিষ্কার সম্পর্কে ননী গোপাল মজুমদার বলেন– "This inscription was originaly fixed on the temple of Ananta Vasudebva at Bhuvanesvar in Puri district, Orissa. In 1810 it was taken out along with another inscription. which belongs to the reign of anivankabhma, by General Stewart and brought over to the Museum of the Asiatic Society at Calcutta. This was looked upon as a great sacrilege by the priests of Bhuvanesvar ; and in 1837 when Major Kittoe visited the place they made a representation to him and the Major arranged with the Asiatic Society for the restitution of the inscribed stones. These are accordingly seat back that very year, but instead of being replaced in their original positions , they were fixed on the western wall of the temple courtyard where they may be seen to-day." [৬৮]

অর্থাৎ এই অভিলেখটি উড়িষ্যার পুরী জেলার ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেব মন্দিরে যথাযথভাবে উৎকীর্ণ হয়েছিল। Anivankabhima এর রাজত্বকালে ১৮১০ সালে এটি অন্য একটি অভিলেখের সাথে জেনারেল স্টুয়ার্ট কর্তৃক কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ামে রক্ষিত হয়েছিল। এই ঘটনাকে ভুবনেশ্বরের পুরোহিতের চোখে মহাঅপবিত্র করণের কাজ বলে গণ্য হয়েছিল।

১৮৩৭ সালে মেজর KITTOE স্থানটি পরিদর্শন করেছিল। তখন তারা ঘটনাটির বর্ণনা করে নিবেদন করেছিল এবং মেজর পাথরের অভিলেখটি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে পুনরুদ্ধার করেন। সে গুলো যথার্থভাবেই যথাশীঘ্র সে বছরেই ফেরত পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো অরিজিনাল স্থানে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। সেগুলো মন্দিরের উঠানের পশ্চিমের দেওয়ালে স্থাপন করা হয়েছিল, যা আজও দেখতে পাওয়া যায়।

অভিলেখটি এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

"The inscription was first published in 1837 by James Prinsep, along with a translation by Capatin G.T. Marshal, in the

---

৬৮. Nani Gopal Majumder. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol.VI, pp. 88-97. This text and translation were subsequently reproduced by Rajendra Lal Mitra in1880,in his Antiquities of Orisra, vol.II. pp85-88.This inscription was critically edited some twenty years later by Professor Kielhorm in the Epigraphia Indiea,vol.V1.pp 203-207 ,from a set of ink impressions furnished by the Archaeological Survey of India."[৬৯]

অর্থাৎ অভিলেখটি ১৮৩৭ সালে জেমস্ প্রিনসেপ এবং ক্যাপটেন জিটি মারশাল কর্তৃক অনুদিত হয়ে 'এশিয়াটিক জার্নাল অব বেঙ্গল'- এ প্রকাশিত হয়; যার ভলিউম পৃষ্ঠা ৮৮-৯৭। এই ও অনুবাদ পরবর্তীকালে রাজেন্দ্র লাল মিত্র সিএ কর্তৃক অনুলিপিকৃত হয়ে ১৮৮০ সালে উড়িষ্যার সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। তার ভলিউম নং ১১পৃ ৮৫-৮৭।

এই অভিলেখটি আরো ২০ বছর পর যখন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক একটি সাধারণ গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল; যার কিছু অংশ প্রফেসর কিটিক্যাল কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছিল।

"The inscription in engraved one slab of stone and consists of 25 lines covering a space of 3′ by 1′4$\frac{3}{4}$″. The Work neatly and carfuly done. Excepting a few letters in line 24 which are hopelessly effaced, the record is in an excellent state of preservation. The letters are about $\frac{1}{2}$″ in hight. The charecteres are of a Northern Nagari type and contain the Proto-Bengali forms that oceur in the 11th and 12th century inscriptions of North-Eastern India." [৭০]

অর্থাৎ অভিলেখটি পাথরের ফলাকার উপরে খোদিত করা হয়েছিল যা পঁচিশ লাইনের এবং যার দৈর্ঘ্য তিন ফুট এবং প্রস্থ পৌনে দুই ফুট। এই কাজটি পরিষ্কার এবং যত্নের সাথে করা হয়েছিল। ২৪ লাইনের মধ্যে সামান্য কয়েকটি বর্ণকে অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘষে ফেলা হয়েছিল। রেকর্ডটি খুবই সুন্দরভাবে বিবৃত করা হয়েছিল। অক্ষরগুলো ছিল প্রায় ১.৫ ইঞ্চি উঁচু। অক্ষরগুলো ছিল উত্তর নাগরীর আদর্শে গঠিত এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রত্ন-বাংলা লিপির।

৬৯. Nani Gopal Majumder. পূর্বোক্ত, পৃ.২৫।
৭০. Nani Gopal Majumder. পূর্বোক্ত, পৃ.২৫।

Dhaka University Institutional Repository

দিনাজপুরের দোরাইলে প্রাপ্ত শিলালিপিঃ

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুরের দোরাইলে একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। নিম্নে শিলালিপিটির নমুনা উপস্থাপন করে তার পাঠোদ্ধার দেওয়া হলো।

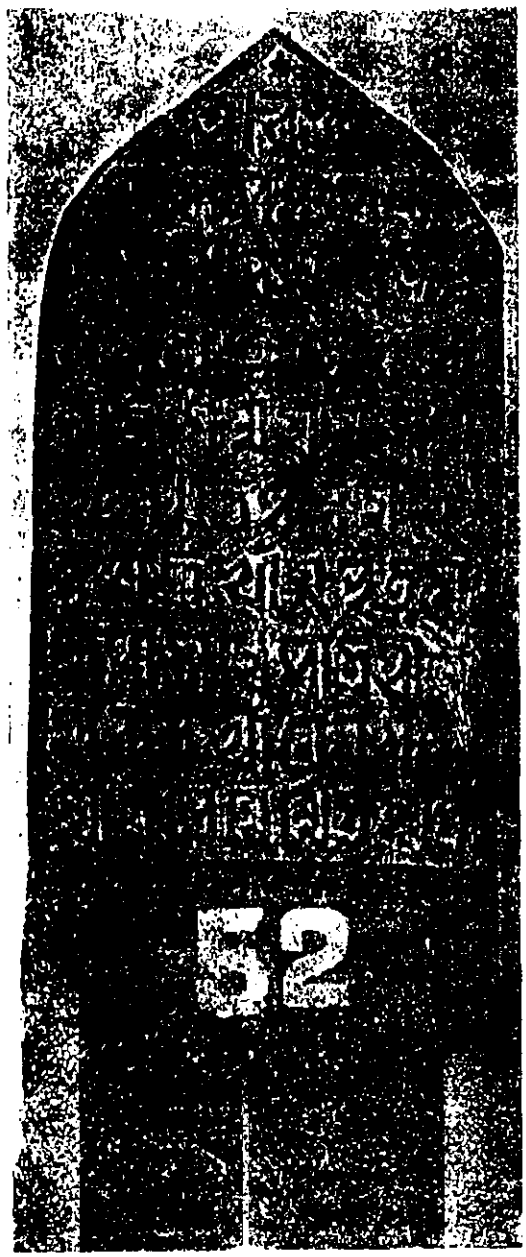

৭১. Shamsud-Din Ahmed. Inscription of Bengal, Volume IV (1st Varendra Research Museum, Raj-1960), Fig-49.

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত শিলালিপির পাঠোদ্ধার নিম্নরূপ –

"শ্রী রস্তু
শাকে পঞ্চ-পঞ্চা-
শদর্ধিক-চতুর্দ্দ–
শ শতাঙকিতে মধৌ
শ্রী শ্রীমম্মহামদুসা
হ নৃপতেঃসময়েনূ-
রবাজখান পুত্রম-
হাপাত্রাধিপাত্র শ্রীম-
ৎ ফরাস খানেন সংক্র-
মোয়ং বিনির্ম্মিত ইতি।"[৭২]

উক্ত শিলালিপির বাংলা অনুবাদ –

'আপনার জীবনে কল্যাণ বয়ে আনুক। এই সেতুটি সুলতান মাহ্মুদের রাজত্বের গৌরবময় সময়ে নুরবাজ খানের পুত্র ফরাস খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৫৫ শকাব্দে।' উপর্যুক্ত লিপির বাংলা অনুবাদ করে বোঝা গেল যে, সুলতান মাহ্মুদের রাজত্ব কালীন সময়ে ফিরোজ খান কর্তৃক সেতুটি নির্মিত হয়। ১৪৫৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৩৩ সালে । কারণ শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ বছর যোগ করলে খ্রীষ্টীয় সাল পাওয়া যায় (১৪৫৫+৭৮ =১৫৩৩) ।

শিলালিপি আবিষ্কারের কাহিনীঃ শিলালিপি আবিষ্কার সম্পর্কে শামস্-উদ-দীন আহমদ 'Sanskrit Inscription Of Dhorail, Dinajpur' প্রবন্ধে বলেন– " The Record was traced by Kumar Sarat Kumar Ray of Dighapatia, at the village of Dhorail in the district of Dinajpur during his investigation tour round north Bengal, for collection of antiquitious of old Varandra"[৭৩]

অর্থাৎ 'দিঘাপতির কুমার শরৎকুমার রায় যখন উত্তর বাংলার প্রাচীন বরেন্দ্র ভূমির লিপিমালা সংগ্রহের কাজ করছিলেন, তখন তিনি দিনাজপুর জেলার দরাইল গ্রামে এই শিলালিপিটি দেখতে পান।'

এই শিলালিপি ১০ টি লাইনে সমাপ্ত একটি বালির পাথরের মূর্তির ওপরে খোদিত। এই ১০ টি লাইন ৩৯ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ১৫.৫ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং কমপক্ষে ৫ ইঞ্চি গভীরভাবে খোদিত। আর লিপিগুলো দেখতে স্পষ্ট আধুনিক বাংলা লিপির মত।

---

৭২. Shamsud-Din Ahmed. Inscription of Bengal,পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৫।
৭৩. Shamsud-Din Ahmed. Inscription of Bengal,পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

এই লাইনগুলো বরেন্দ্র মিউজিয়ামের সাবেক কিউরেটর নীরদবন্ধু স্যান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে 'Indian Historical Quarterly' তে স্থান পায় । এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The record has been edited by Babu Nirodbandhu Sanyal, late qurator of the Varendra Research Museum, Rajshahi in the Indian Historical Quarterly Vol-VIII, 1931. PP. 17-18 with a facsimile."[৭৪]

অর্থাৎ 'বরেন্দ্র মিউজিয়ামের সাবেক কিউরেটর নীরদ বন্ধু স্যান্যাল কর্তৃক রেকর্ডটি সম্পাদিত হয়ে ১৯৩১ সালে ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়াটারলতিে ছাপা হয়। যার ভলিউম নং তৃতীয়, পিপি নং ১৭-১৮' । লিপিপত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় লিপিপত্রের ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু লিপির হরফ বাংলা । মুসলিম শাসন আমলে মুসলমানেরা বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপির চর্চা করেন। এবং সংস্কৃত ভাষাও তাদের চর্চার বাইরে ছিলো না। কারণ ড. এম. এ. রহিম- এর মতে, "বাংলা ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণদের অবজ্ঞা সূচক ঔদাসীন্য এবং সংস্কৃত প্রভাবিত গৌড়ের (উত্তর ও পশ্চিম বাংলা) হিন্দু রাষ্ট্র ও সমাজের নিকট বাংলা ভাষাও যুগ যুগ ধরে অপাংক্তেয় থেকে যেত এবং এর বর্তমান গৌরবের আসন থেকে বঞ্চিত হত। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানরা কেবল বাঙ্গালীর রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেনি, তারা বাংলা ভাষাভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।"[৭৫]

ঢাকার ডাল বাজারে প্রাপ্ত শিলালেখ

ঢাকায় চন্দদেবীর প্রতিমূর্তির পাদদেশে শিলালেখে বাংলা লিপির নিদর্শন পাওয়া গেছে; যার লিপিকাল ১২ শতাব্দী। এ সম্পর্কে 'Nani Gopal Majumdar তার 'Image Inscription of the Reign of Lakshman Sena' প্রবন্ধে বলেছেন– "This inscription, which is incised on the pedestal of an image of chandi was discovered in 1911 at Dalbazar in the town of Dacca by Mr.R.D. Banergi. An account of the image as well as the inscription has already been published by him in the Journal of the Asiatic Society of Bengal N.S. vol. IX (1913) PP. 289-290 and plates."[৭৬]

৭৪. Shamsud-Din Ahmed. পূর্বোক্ত,পৃ. ২৩৬।

৭৫. ড. এম. এ. রহিম। অনুবাদঃ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস(প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮২) পৃ. ২৪৭।

৭৬. Nani Gopal Majumder. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ চন্দদেবীর প্রতি মূর্তির পাদদেশে যে লেখমালা উৎকীর্ণ হয়েছিল তা ১৯১১ সালে আর. ডি. ব্যানার্জি কর্তৃক আবিস্কৃত হয়েছিল যা ঢাকা শহরের ডালবাজারে পাওয়া গিয়েছিল। লেখমালা ও প্রতিমূর্তিসহ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে তা (N.S. VOL. IX (1913) pp. 289-290) প্রকাশিত হয়েছিল।

চন্দদেবীর বর্ণনা দিয়ে এ শিলালেখের আবিষ্কারক R.D. Banerji যা লিখেছিলেন তা হলো– " The image, which bears the inscriptions, represents a goddess with four hands standing on a fully expanded lotus . she holds a lotus and water-pot in her right hand, a battle axe in her upper left and her lower left hand is in the posture of blessing. A female attendent stands on each sight of her holdig a flywhisk. The main image stands under a sort of porch or niche probably intendend to represent a temple on the pedistal is the inscription in two lines on a plain board in front and a receesset corner of each side. On the top of the niche or shrine are two elephant, one on each side with vases on their up raised trunks as if they are pouring water over the head of the goddess. " [৭৭]

বাংলা অনুবাদ :

'যে মূর্তিটি উৎকীর্ণ লিপিগুলো বহন করছে, সেখানে একটি সম্পূর্ণ বিকশিত পদ্মের উপর চার হস্ত বিশিষ্টদেবী মূর্তি বিদ্যমান। সে তার ডান হাতে একাট পানি পাত্র ও পদ্ম ধরে আছে , এবং তার উপরের হাতের বাম হস্তে একটি যুদ্ধ কুড়াল, এবং তার নিচের বাম হাতটি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে রয়েছে। তার প্রত্যেক পাশে একজন করে মহিলার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যারা তাকে পাখা দ্বারা সেবা করছে । সম্ভবত প্রধান মূর্তিটি মন্দিরের বারান্দায় অথবা উপযুক্ত স্থানে অবস্থান করেছে; যা একটি মন্দিরের প্রতিচ্ছবি বহন করছে। উৎকীর্ণ লিপিগুলো মুর্তির পাদদেশে দুই লাইনে রয়েছে এবং তার প্রত্যেক পার্শ্বে বেশ কিছু স্থান ফাঁকা রয়েছে। কুলঙ্গি অথবা পবিত্র স্থানে শীর্ষে প্রত্যেক পার্শ্বে হাতি রয়েছে, যারা তাদের শুড় দ্বারা কারুকার্য করা পাত্রের সাহায্যে দেবীর মাথার উপর পানি ঢালিতেছে।'

---

৭৭. উদ্ধৃত। Nani Gopal Majumder. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে চন্দদেবীর ইমেজসহ স্তম্ভমূলের পাদদেশে প্রাপ্ত শিলালেখের চিত্র প্রদর্শিত হলো–

ROYAL SEAL
of the Sena Kings
(from Tarpanadighi Plate)
Full Size

Dacca (or Rampal) Chandi Image inscription
of the reign of Lakshmanasena.

---

৭৮. Nani Gopal Majumder. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত শিলালেখের পাঠোদ্ধার হলো–

অ
১- শ্রী মল্লক্ষ্মণ
২- সেন দেবস্য সং ৩
ই
১- মালদেই সুত অধিকৃত শ্রী দামাদ্র-
২- ণ শ্রীচণ্ডীদেবী সমারঙ্কা তভ্রাদকণা
ঈ
১- শ্রী নারায়ণেন
২- প্রতিষ্ঠিতেতিঃ ॥

প্রাপ্ত শিলালেখের অর্থঃ 'লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের গৌরবময় তৃতীয় বছরের মল্লদেবের পুত্র দমোদার কর্তৃক চন্দদেবীর প্রতিমূর্তির কাজ শুরু হয়েছিল, তার ছোট ভাই নারায়ণকে আনুষ্ঠানিক ভাবে পদাভিষিক্ত করার জন্য ।' উক্ত শিলালেখ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, শিলালেখে সন্ধিযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণ: শ্রীমৎ +লক্ষ্মণ=শ্রীমল্লক্ষ্মণ।

পাটনা জেলায় বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ অভিলেখ

বিহারের অন্তর্গত পাটনা জেলার কোন একটি মন্দিরের গায়ে বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ অভিলেখটি আবিস্কৃত হয়েছিল। অভিলেখটি পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অভিলেখটি ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। 'এই উৎকীর্ণ অভিলেখটি এস.হিব সোহেলী (আই সি এস) মহোদয় কর্তক আবিষ্কৃত হয়েছিল'।[৭৯]

উক্ত শিলালেখের পাঠ, সংশোধিত পাঠ এবং বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

শিলালেখের পাঠ

"১। অব্দে বিক্রম-ভূভূজ গুনশারে বানে তথা রূপাকে
পৌসে মাসি তিথো১ স [প্তর্মকে] চ-প-
২। ক্ষেচ বলক্ষোতরে। রুধিরোদগারি বৎসরে দিনে
সুরগু রোধ-র্ম্মার্থন্তি (?)-
৩। রে সীষ্ট শীরাজধরঃ সবেষ্টারো(?) কীর্তি মিসাং
চ কারিতং। শুভমস্তু(?) "।[৮০]

৭৯. ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার। শিলালেখ-তাম্র শাসনাদির প্রসঙ্গ (প্রথম প্রকাশ, সাহিত্যলোক, কলিকাতা-১৯৮২) পৃ. ১৭৫।
৮০. ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার। পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধনী পাঠ

(গীতিছন্দ)

"অব্দে বিক্রম ভূভূজ গুণে শরে বানে তথা রূপকে
পৌষে মাসি তিথৌ ষ সপ্তমকে পক্ষে চ বলমে তরে। ১
রুদি রোদগারি-বৎসরে দিনে সুরগুরোর্ধর্ম্মন্তীরে।
সৃষ্ট শ্রী রাজধরঃ স-বিষ্টরঃ কীর্ত্তিমিমাং কারিঅম ॥২
শুভমস্তু।"[৮১]

বঙ্গানুবাদ

"ত্রিগুণ, পঞ্চসর, পঞ্চবাস এবং একরূপ দ্বারা গণিত রাজা বিক্রমের সংবৎসরে (সংবৎ১৫৫৩) এবং বৃহস্পতি-চক্রের রুধিরোদ্বগারিস সংঙ্গক বৎসরে,পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী তিথি বৃহস্পতিবারে গঙ্গাতীরে পীঠ সহ শ্রীরাজধর (অর্থাৎ রাজধর সংঙ্গক দেববিগ্রহ) নির্মিত হলেন এবং এই কীর্তি (অর্থাৎ কীর্তি খ্যাপক মন্দির) নির্মান করানো হলো। মঙ্গল হোক"।[৮২]

এ অভিলেখ পরীক্ষা করলে দেখা যায়– "আলোচ্য লিপিতে মাত্র তিন পঙক্তি লেখ খোদিত আছে ,তাতে যে স্থান জুড়েছে, তা লম্বায় প্রায় দু ফিট এবং প্রস্থে সাড়ে তিন ইঞ্চি।অক্ষরগুলি অযত্ন- লিখিত এবং অসমাকার। অভিলেখটিতে মধ্যযুগের শেষার্ধে প্রচলিত বঙ্গাব্দে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রস্তরে খোদিত বলে উৎকীর্ণ অক্ষর গুলির আকার দু এক স্থলে সমসাময়িক বঙ্গীয় পুথির অক্ষর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, এস্থলে 'অ'বর্ণের আকার দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বৈদ্যদেবের কমৌলি শাসনে প্রাপ্ত 'অ'এর অনুরূপ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ' প্রভৃতি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত কয়েকটি অক্ষরের আকার বর্তমান লেখের তুলনায় কিঞ্চিৎ আধুনিক বলে বোধ হয়"।[৮৩]

অভিলেখটির ভাষা ও উৎকীর্ণের তারিখ

অভিলেখটির ভাষা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, "লেখটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; কিন্তু এতে অনেক ভাবগত ত্রুটি আছে। মাত্র দুটি শ্লোকের রচনা ; তাতে ছন্দেরও ত্রুটি দেখা যায়। লেখের তারিখে উত্তর ভারতে প্রচলিত বৃহস্পতি চক্রের নাম ব্যবহৃত হয়েছে। নামটি রুধিরোদ্‌গারী।এর সহিত বিক্রমাব্দের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে যে,গুণ (অর্থাৎ৩) শর (অর্থাৎ৫) বাণ (অর্থাৎ ৫)এবং রূপক বা রূপ (অর্থাৎ) এই শব্দগুলির দ্বারা গণিত বিক্রমবৎসরই আলোচ্য লেখের তারিখ।

---

৮১. ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার। পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৫।
৮২. ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার। পূর্বোক্ত, ১৭৫।
৮৩. ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার। পূর্বোক্ত, ১৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং 'অঙ্কানাং কমতো গতিঃ' অনুসারে আমরা ১৫৫৩ বিক্রমাব্দ পেলাম । এই বৎসরটি রুধিরোধকারী বর্ষ ও বটে । খ্রীষ্টাব্দের গণনায় এটি ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। লেখটিতে পূর্বোক্ত বৎসরের পৌষ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি এবং বৃহস্পতিবারের উল্লেখ আছে। তারিখটি ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী।"[৮৪]

নয়াহাটি কপার প্লেট

নয়াহাটি কপার প্লেট অব বল্লাল সেন সম্পর্কে Nani Gopal Majumder তাঁর 'Inscription of Bengal' গ্রন্থে বলেন–

"This copper–plate was unearthed in 1911,by a number of labourers while repairing a roadin the village of Naihati, in the katwa sub- division of the District, of Burdwn, at a distance of about one hundred yards from the western bank of the river Ganges. The findspot is six miles from Katwa and falls within The estate of Babu Baidyanath chatterji, Zaminder of Sitahati, which is a village adjacent of Naihati." [৮৫]

অর্থাৎ ১৯৯১ সালে যখন অনেক শ্রমিক নয়াহাটি গ্রামের একটি রাস্তা মেরামত করছিল, তখন কপার প্লেটটি মাটি খুড়ে পাওয়া গিয়েছিল। নয়াহাটি কতোয়ার সাব-ডিভিশন বর্ধমান জেলায় এবং যা গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীর থেকে প্রায় ১০০গজ দূরে অবস্থিত।সু-নির্দিষ্ট স্থানটি কতোয়ার থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত এবং নয়াহাটি গ্রামটি সীতাহাটির জমিদার বাবু বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জির কর্তৃত্বাধীন ছিল।

কপার প্লেটটি বেশ কয়েকজন বিদ্বান ব্যক্তি কর্তৃক বাংলা অনুবাদসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; এবং এরপরে কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে স্থান লাভ করে। এ সম্পকে ননী গোপাল মজুমদার উল্লেখ করেছেন– "The inscription was pullished along with a Bangali translation by Mr. Tarak Chandra Ray in the journal of the Vangiya Sahitya Parisahat, VOL.XVII PP 231-245 and plates and by Mr. Banwary Lal Goswami in the pravasi, 1317 BS PP. 530-33. An Article containing a better addition an translation of the record was published in Bengali by Messers A.K. Maitra and R.G. Basak in the Sahitya (Calcutta, B.S-1318), V-XXII PP. 519-27 and 575-85. It was there after edited and translated by Mr. R.D Banerji in the epigraphia indica, VOL-XIV PP. 156-63 and plates. The present treatment in based on set of inked estampages taken from the original copper plate, now deposited in the Indian Museum Calcutta."[৮৬]

৮৪. ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার। পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৩।

৮৫. Nani Gopal Majumder. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮।

৮৬. Nani Gopal Majumder. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

এই লিপির আকার-বৈচিত্র্য সম্পর্কে বলা হয়েছে– "This is a single plate measuring $13\frac{5}{8}''$ by $15''$. At the top is affiexed a seal, containing a representation of Sada siva. The Writing is very neatly and beautifully done and consist of 64 lines, of which thirty two are engraved on the obvers and thirty two on the reverse. The size of the letter is about $\frac{3}{8}''$. The charateristics belong to a variety of the Northern alphabets, which may be called the precursors of the modern Bengali, as current in northeastern India in the 12th century A.D." [৮৭]

বাংলা অনুবাদ : 'এটি একটি ১৩$\frac{৫}{৮}$ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ১৫ ইঞ্চি প্রস্থের একক প্লেট। এর শীর্ষ ভাগ একটি সীল ছাপ দ্বারা সংলগ্ন , যা সদাশিবের প্রতি মূর্তি বহন করছে । দীর্ঘ ৬৪ লাইনের এই লেখা গুলো খুবই পরিষ্কার এবং সুন্দর । যার ৩২ টি লাইন সোজাসুজি ভাবে অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাবে লেখা হয়েছিল । এবং বাকি ৩২ টি লাইন তার বিপরীত দিক থেকে লেখা হয়েছিল , বর্ণগুলোর উচচতা ছিল প্রায় $\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি। লিখিত বর্ণ গুলো উত্তরাঞ্চলের বর্ণমালার রূপের মতো , যা আধুনিক বাংলার পূর্ববর্তী রূপ , এবং যা ১২ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচলিত ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, নারায়ণ পালের বাদাল স্তম্ভ পাল আমলের, দিনাজপুরের দোরাইলে প্রাপ্ত শিলালেখ মুসলিম আমলের,পাটনা জেলার মন্দিরে বঙ্গাক্ষরে প্রাপ্ত শিলালেখও মুসলিম আমলের উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেবের শিলালিপি অব্রাহ্মণরাজার আসামে প্রাপ্ত হস্রকোলের লেখ যা বৌদ্ধ শিলালেখ নামে পরিচিত। এ ছাড়া অন্যান্য শিলালেখ– বিজয় সেনের দেওপাড়া লেখ, লক্ষণ সেনের দানপত্র,কামরূপ বৈদ্যদেবের দানপত্র, ভুবনেশ্বরের শিলালেখ, মুর্শিদাবাদ জেলার রাধা অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালেখ ঢাকার ডালবাজারে প্রাপ্ত শিলালেখ– মূলত এ শিলালেখ গুলো সেন রাজা ও ব্রাহ্মণদের রাজত্বকালীন সময়ে উৎকীর্ণ।

উপর্যুক্ত সকল শিলিালিপি আলোচনার শেষে বলা যায়, "পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আর সেন রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী । তাদের রাষ্ট্রীয় ভাষায় বা রাজকীয় সভায় বাংলা ভাষা চর্চার কোন স্থান ছিল না। পালেরা যে সংস্কৃত চর্চা করতেন তা ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃত, আর সেনেরা যে সংস্কৃত চর্চা করতেন তা ছিলো পাণিনি-সংস্কৃত। এদের রাজসভায় সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন সাহিত্যের চর্চা হয়নি। এজন্য বাংলা অক্ষরে লেখা এ সব লিপিপত্রের নিদর্শন সন্দেহাতীত নয় বলে কেউ কেউ মনে করেন" ।[৮৮]

ড. এস. এম.লুৎফর রহ্মান মনে করেন,' দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দিতে উৎকীর্ণ অব্রাহ্মণ রাজাদের শিলালিপির যতটুকু বিশ্বাস যোগ্যতা স্বীকার্য, সেন- বর্মন -রাজাদের বাঙলা হরফে উৎকীর্ণ সংস্কৃত ভাষায় নিবন্ধ শিলালিপির বিশ্বাস যোগ্যতা ততটা স্বীকার্য নয়।' [৮৯]

৮৭। Nani Gopal Majumder. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮।

৮৮। ড. এস.এম. লুৎফর রহমান । বাঙালালিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস। (বাংলা একাডেমীতে যন্ত্রস্থ) পৃ.১-১৪৮।

৮৯। ক) ড. এস.এম. লুৎফর রহমান । ঐ। খ) ড. এস.এম. লুৎফর রহমান। বাঙালীর লিপি, ভাষা, বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস (২য় খণ্ড), ঢাকা-২০০৪। ১ম প্রবন্ধ, দ্র.

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক যুগে বাংলাদেশে (১৪০১-১৮০১) বাংলা লিপির আলোচনা

ঐতিহাসিক যুগে বৃহত্তর বাংলাদেশে বহু পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। মুদ্রণ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিই ছিল সাহিত্যের একমাত্র বাহন এবং এই পাণ্ডুলিপিগুলোর খুব কদরও ছিল। ১৭৭৮ সালে ভারতীয় বাংলার হুগলীতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর থেকে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির সংখ্যা কমতে থাকে। এর পর ১৮ শতকের শেষে এবং ১৯ শতকের শুরুতে বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। এভাবে এক পর্যায়ে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পাণ্ডুলিপিগুলোতে সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উপাদান বিদ্যমান থাকায় সেগুলোর প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায়নি। এসকল পাণ্ডুলিপিতে বাংলা লিপির ব্যবহার-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যে গ্রন্থ অবলম্বনে বাংলা লিপির ব্যবহার-বৈচিত্র্য ও তার লিপিকাল নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে; তা হলো বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক ১৯০৯ সালের বাকুড়া জেলার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘরে পাণ্ডুলিপিটি আবিস্কৃত হয়। এ পাণ্ডুলিপিটিতে সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন লিপিকাল নির্দেশিত হয়নি। তবে বিভিন্ন বিদ্বান ব্যক্তির আলোচনা-সমালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুথিটি পঞ্চদশ শতকের রচনা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির হাতের লেখা, কালি ও কাগজ সম্পর্কে যে সব মতামত পাওয়া যায়; তা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির হাতের লেখা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে । জনাব বসন্তরঞ্জন রায়ের ধারণা- 'পুথি তিন হাতে লেখা।' [৯০]

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের অনুমান– "পুথি দুই স্টাইলের লেখা, একটি ধরে ধরে সাজানো লেখা ,আর একটি দ্রুত টানা লেখা। কিন্তু লেখা সাজানোই হোক বা টানাই হোক অক্ষরের আকৃতি বা ফর্ম এক।" [৯১]

ড. সুকুমার সেনের অভিমত, "পুথিটি-দুইটি ভিন্ন হাতের লেখা "।[৯২]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি লেখার কালি সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন মত প্রকাশ করে বলেন, "কালি হালকা তাহাতে প্রাচীন পুথির কালির গাঢ়তা ও উজ্জ্বলতার আভাস মাত্র নাই"।[৯৩]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর পুথির কাগজ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন বলেন, " কাগজ পাতলা, মাড়ের তৈয়ার। ঠিক যেন মিলের কাগজ। এরকমে কাগজে লেখা পুথি বা দলিল অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে দেখি নাই, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যথেষ্ট দেখিয়াছি"।[৯৪]

---

৯০. তারাপদ মুখোপাধ্যায়। শ্রী কৃষ্ণকীর্তন,(কলিকাতা -১৯৭৮) পৃ.২৫।

৯১. তারাপদ মুখোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত, পৃ.২৫।

৯২. শ্রী সুকুমার সেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (কলিকাতা-১৯৭৮) পৃ.১৩৮।

৯৩. শ্রী সুকুমার সেন। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮।

৯৪. শ্রী সুকুমার সেন। পূর্বোক্ত,পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিটি আবিষ্কারের পর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিপি পরীক্ষা করে বলেন, "১৩৮৫ খ্রি. পূর্ববর্তী কোন এক সময়ে হচ্ছে এর লিপিকাল"।[৯৫]

তাঁর এই মত অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে– 'এর লিপিকাল ১৪৬৬ খ্রি. পূর্ববর্তী।' [৯৬]

রাধাগোবিন্দ বসাক অনুমান করেন, ১৪৫৯-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এটি অনুলিখিত হযেছিল। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাধাগবিন্দ বসাক এর মত সমর্থন করেন।" [৯৭]

এস.এন. চক্রবর্তী বলেন,"লিপিতত্ত্ব বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অবশ্যই পঞ্চদশ শতাব্দীর পুথি বোধিচর্যাবিতার (১৩৩৫) এর সমসাময়িক।" [৯৮]

যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন, "এই পুথিটি ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লিখিত"।[৯৯]

সুকুমার সেনের মতে, " শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দী শেষার্ধে"।[১০০]

ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম মত প্রকাশ করে বলেন, " শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী হওয়াই সম্ভব।"[১০১]

---

৯৫. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা(৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা-২০০০) পৃ. ১৭১
৯৬. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। ঐ, পৃ. ১৭১।
৯৭. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। ঐ, পৃ. ১৭১ ।
৯৮. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। ঐ, পৃ. ১৭১ ।
৯৯. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। ঐ, পৃ. ১৭১ ।
১০০. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। ঐ, পৃ. ১৭১ ।
১০১. ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১ ।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির একটি পৃষ্ঠার নমুনা, তার পাঠোদ্ধার উদ্ধৃত হলো এবং এ পুথিতে লিখিত লিপিগুলোর বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

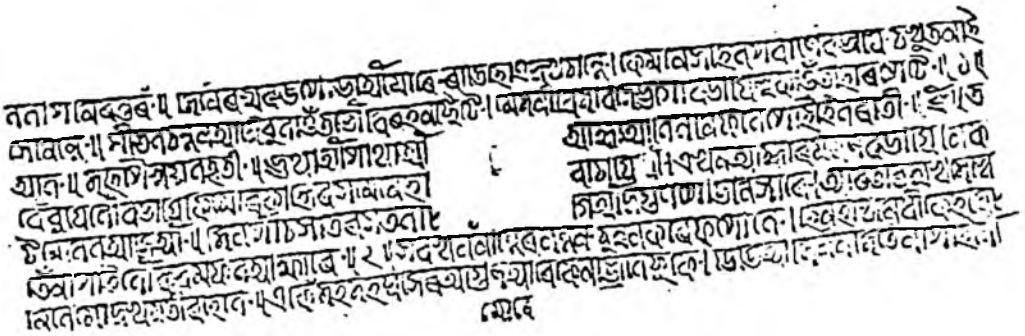

"ললাপ নিরন্তরং ॥ দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে রাতিহোএ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরানে চখুত নাই সে নিন্দে ॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাওঁ তভোঁ বিরহ না টুটে ।
মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি লুকাওঁ তাহার পেটে ॥ ১ ॥
আল ॥ দহে পৈসু কাল দুতী।
উথাআঁ পাথাআঁ আহ্মা আনিল নিফলে পোহাইল রাতী ॥ ধ্রু ॥ ত
বেঁ বুয়িলোঁ বড়ায়ি কি মোর কাহ্নের সমে নেহা বাঢ়ায়িআঁ ।
এখন আহ্মার মরণ বড়ায়ি নিকট মেলিল আসিয়া ॥
দিন পাঁচ সাত রসতলা গিআঁ
দ্বিগুন পোড়ানি সারে। আর তার মুখ দেখি
তেঁ না পাইলোঁ করম ফল আহ্মারে ॥ ২ ॥
সব খন মোরে নান্দের নন্দন চুম্বন করে কপোলে। হেন হাথ নিধী কে হরি
নিলে মো দুখমতীর হেলে ॥ এঁকে দহদহ ঘসির
আগুন আরে কে না জ্বালে ফুকে। ভিড়ি আলিঙ্গন দিতে না পাইলোঁ ॥"[১০৩]

---

১০২. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২।
১০৩. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

আ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর 'আ' হরফের মাথার আকৃতি আধুনিক বাংলা 'আ' এর নিকটবর্তী। 'অ'এর সঙ্গে সংযুক্ত আকার লম্বালম্বিভাবে দাড়ির মত টান দিয়ে দেখানো হয়েছে

ই- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর 'ই' হরফের মাথার আকৃতি আধুনিক বাংলা 'ই' এর নিকটবর্তী।

উ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর 'উ' হরফের সাথে আধুনিক বাংলা 'উ' এর বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। আধুনিক 'উ' এর উপরে উড়ানী আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'উ' এর সর্বনিম্ন ভাবে একটি বক্র রেখা রয়েছে যা সংস্কৃত এর মত।

ঋ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর 'ঋ' হরফের সাথে আধুনিক বাংলা 'ঋ' এর বেশ পার্থক্য বিদ্যমান।

ঐ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ঐ' বর্ণ খুব সহজেই আধুনিক বাঙলা বর্ণ থেকে পৃথক করা যায়।

ঔ- আধুনিক 'ঔ' বর্ণের সাথে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 'ঔ' এর বেশ সাদৃশ্য রয়েছে।

ক- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ক' বর্ণকে দেখে সহসা 'ফ' বলে দৃষ্টি বিভ্রম হয়। এর বাম ও ডান দিকের এর আকৃতি অনেকটা 'ফ' এর মতই। শুধু 'ক' এর মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা এখানে খাড়া দণ্ডটির সঙ্গে গেছে।

খ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'খ' এর সাথে আধুনিক বাংলা বর্ণমালার 'খ' এর আকৃতির পার্থক্য হয়েছে বাম দিকের গোলাকৃতি অংশটির জন্য।

গ- 'গ' এর ক্ষেত্রেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর 'গ' এর সাথে আধুনিক বাংলা বর্ণমালার 'গ' এর সাথে বেশ পার্থক্য নজরে আসে।

ঘ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর 'ঘ' এর নিম্নাংশের আকৃতি আধুনিক বাংলা বর্ণমালা 'ঘ' এর নিম্নাংশের আকৃতি থেকে পৃথক।

চ- আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'চ' ও আধুনিক বাংলা বর্ণমালার 'চ' এর পার্থক্য নজরে না পড়লেও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পার্থক্য বোঝা যায়।

ছ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর 'ছ' হরফের আকৃতি আধুনিক বাংলা 'ছ' এর নিকটবর্তী বলে মনে হয়।

জ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর বর্গীয় 'জ' বোঝা গেলেও তা আধুনিক বাংলা বর্ণমালা থেকে আলাদা ধরনের।

ট- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর পুথির 'ট' এর ঊর্ধ্বাংশ আধুনিক বাংলা বর্ণমালার 'ট' এর ঊর্ধ্বাংশের প্রায় সমরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

ঠ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর পুথির 'ঠ' কে বর্তমান বাংলা লিপির 'ঠ' এর চেতন বাদে নিম্নাংশের অনুরূপ বলে মনে হয়।

ণ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর পুথির 'ণ' আধুনিক বাংলা 'ণ' থেকে একটু আলাদা ধরনের ।

থ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর পুথির 'থ' আধুনিক বাংলা 'থ' থেকে একটু আলাদা ধরনের ।

দ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর পুথির 'দ' আধুনিক বাংলা 'দ' এর প্রায় সমরূপ।

ধ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর পুথির 'ধ' আধুনিক বাংলা 'ধ' এর মত।

ন- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ন' এর বাম দিকের আকৃতি অনেকটা গোলাকার বৃত্তের মত। আধুনিক বর্ণ থেকে সহজেই পার্থক্য করা যায়।

ফ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ফ' এর সঙ্গে আধুনিক বাংলা বর্ণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য রয়েছে।

র- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর পুথির 'র' পেট কাটা দেখা যায়।

শ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 'শ' এর সঙ্গে আধুনিক বাংলা বর্ণমালার 'শ' এর বেশ পার্থক্য রয়েছে।

স- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 'স' এর সঙ্গে আধুনিক বাংলা বর্ণমালার 'স' এর বেশ পার্থক্য রয়েছে।

হ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন 'হ' এর সঙ্গে আধুনিক বাংলা বর্ণমালার 'হ' এর পার্থক্য থাকলেও এটি বাংলা বর্ণের মত।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বাংলা পাণ্ডুলিপির বৈচিত্র্য—

ড. মুহম্মদ শাহ্জাহান মিয়া তাঁর 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ-সমীক্ষা' গ্রন্থে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি থেকে লিপির চিত্র তুলে ধরেছেন এবং তার পাঠোদ্ধার দিয়েছেন। যথা –

ক. সপ্তদশ শতক

"১। ৩৬৬৭ (১৬৭২ খ্রী.) সং ঢাবিপু

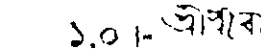

১.০।-

(শ্রী রাধা কৃষ্ণ চরনে প্রসিদ ॥) পৃ. ১১ ক

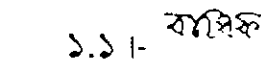

১.১।-

(রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্রো ভজনে সঘন) পৃ. ১১ ক

২। ১১০৬ সি (১৭০০খ্রী.) সং ঢাবিপু

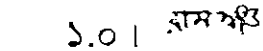

১.০।

(রামকৃষ্ণ দেবতা বটে জানিলো নিদান ॥) পৃ. ১৩ খ

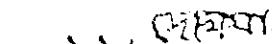

১.১।

(দেখিয়া রামকৃষ্ণ কান্দে উভরায় ॥) পৃ. ১৫ ক

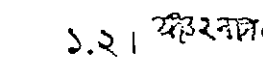

১.২।

(কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোপী ডাকে অচেতনে ॥) পৃ. ১৫ ক

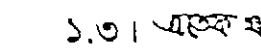

১.৩।

(এতেক যনিয়া কৃষ্ণ হইলা লজ্জিত ॥) পৃ. ১৫ খ

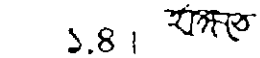

১.৪।

(ইঙ্গিতে গোপিরে কৃষ্ণ কহিলেন কথা) পৃ. ১৫ খ

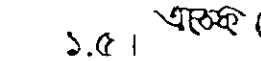

১.৫।

(এতেক দেখিয়া কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে) পৃ. ১৫ খ" ।[১০৪]

১০৪. ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া।বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা (প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪)। পৃ. ৫০-৫১

Dhaka University Institutional Repository

খ অষ্টাদশ শতক

"১। ৬০১৮ (১৭৫৭খ্রী.) সং ঢাবিপু

১.০ ॥

(কৃষ্ণঃ বিনে জিবন অকারন দেখিঃ) পৃ.ঃ ৪ খ

১.১।.

(মরে জিব কৃষ্ণ পাষরিআঃ) পৃ. ৫ খ

১.২।.

(কৃষ্ণঃ না ভজিয়া সংশারে আশিয়াঃ) পৃ. ৫ খ" [১০৫]

নবীবংশ পুথির পাণ্ডুলিপি

সৈয়দ সুলতান রচিত 'নবীবংশ' পুথিটির রচনা কাল ষোড়শ শতকে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ নবীবংশ পুথির পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। পুথিটির সুনির্দিষ্ট রচনাকাল পাওয়া না গেলেও, এ সম্পর্কে কয়েকজন বিদ্বান ব্যক্তির মতামত পাওয়া যায়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-এর মতে, 'পুথিটির রচনা কাল ৯৯৪ হিজরীতে বা ১৫৮৫ সালে।'[১০৬] ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে 'পুথিটির রচনা কাল ১৫৮৫ অথবা ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে।'[১০৭] ড.আহমদ শরীফের মতে, 'সৈয়দ সুলতান নবীবংশ পুথিটি ১৫৮৪-১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচনা করেন।'[১০৮] নিম্নে সৈয়দ সুলতান রচিত 'নবীবংশ' পুথিটির একটি পৃষ্ঠার নমুনা, যা আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত এবং তার পাঠোদ্ধার দেওয়া হলোঃ-

১০৫. ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া।বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা, (প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪)। পৃ. ৫১।
১০৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড), (প্রথম সংস্করণ, ঢাকা-১৯৬৪), পৃ. ১২৩।
১০৭. ড. মুহম্মদ এনামুল হক। মুসলিম বাংলা সাহিত্য, (তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৬৮), পৃ. ১৪৩।
১০৮. ড. আহমদ শরীফ। বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড), (প্রথম সংস্করণ, ঢাকা-১৯৮৩), পৃ. ৬৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

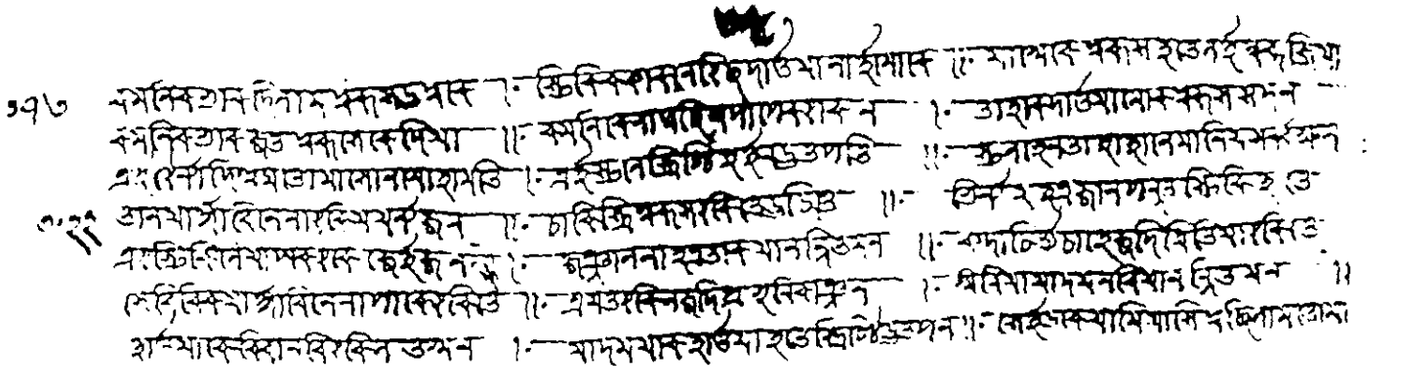

১০৯. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

"রমনির ভার দিলাম পুরুষ উপরে ॥ স্তিরির কারনে কিছু দাওয়া নাই মোরে ॥
য়াখেরে পুরুস হতে লইমু বুজিয়া । রমনির ভার যত পুরুসেরে দিয়া ।
রমনিরে না পুছিমু পাপের কারন। তাহার দাওয়া মোর পুরুস সদন ॥
এই কৈন্যা দিলুম তোমা শোন মোহামতি। এই স্তলে স্রিষ্ট হইল উতপতি।
স্তল হেনো তাহা হানে মানিয় সর্ব্বক্ষন। তান য়াজ্ঞা বিনে না করিয়ো য়ন্য জন।
চারি স্তিরি পুরুস করিতে উচিতে। ভিন্য ভিন্য হএ জান পঞ্চ স্তিরি হতে ॥
এক স্তিরি লৈয়া ঘর করে যেই জন। জঞ্জাল না হএ তার য়ানান্দিত মন ॥
কদাচিত্য চাহে জদি দ্বিতিয়া করিতে। সে বিবির য়াজ্ঞা বিনে না পারে করিতে ॥
এমত করিল জদি প্রভু নিরাঞ্জন। সুনিয়া য়াদম নবী য়ানন্দিত মন।
হাওয়ারে বিবা নবি করিল তখন । য়াদম য়ার হাওয়া হতে স্রিষ্টি উতপন ॥
সেই ডরে য়ামি আসি পুছিলাম তোমা ॥" [১১০]

পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে এই পৃষ্ঠায় মাত্র চারটি স্বরবর্ণের ব্যবহার রয়েছে। সেগুলো হলো ই, উ, এ, ও । আর ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা মোট ১৮ টি । সেগুলো হলো ক, খ, ঘ, চ, ছ, জ, ত, দ, ন, প, ব, ভ, ম, য়, স, হ, র, ল। যুক্তাক্ষর রয়েছে নয়টি সেগুলো হলোঃ- স্ত, ষ্ট, ক্ষ, ঞ্চ, ঞ্জ, জ্ঞ, স্ত্র, ন্দ, দ্ব।

এ বিষয়ে সর্ব প্রথম ড. এস.এম. লুৎফর রহমান বলেন যে, 'মুসলিম আমলে মুসলিম লিপিতত্ত্ববিদ্‌গণ ১৫ টি ব্যঞ্জনবর্ণ ও ৩ টি স্বরবর্ণ বা ১৮ অক্ষরে বাংলা লেখার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন' ।[১১১]

পদ্মাবতী পুথির লিপি

মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য 'পদুমাবৎ' মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল কর্তৃক 'পদ্মাবতী' নামে অনুদিত হয়। বিদ্বানগণের মতে, এ কাব্যটির অনুবাদ শেষ হয় ১৬৫১ সালে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। অবশ্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, 'পদ্মাবতী কাব্যের রচনা কাল ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে।'[১১২]

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ 'পদ্মাবতী' পুথি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যায় তিনি 'পদ্মাবতী' পুথি সম্পর্কে লিখেছিলেন, "চট্টগ্রামে আলাওলের পদ্মাবতীর খুবই আদর। নানা দৈবোৎপাতে হস্ত লিপিগুলো প্রায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। পদ্মাবতী ছাপা হইয়া যাওয়াতেও লোকে আর প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি সাদরে রক্ষা করে নাই। তথাপি এখনও অনেক প্রাচীন পুথি মিলিতে পারে। আলাওলের স্বহস্তে লিখিত বলিয়া কথিত একখানি পদ্মাবতীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে একখানা আরবী পাণ্ডুলিপিরও সন্ধান পাইয়াছি"।[১১৩]

---

১১০. ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮ ।

১১১. ড. এস. এম. লুৎফর রহমান। বাঙালীর লিপি-ভাষা, বানান ও জাতির ব্যতিক্রম ইতিহাস (১ম খণ্ড), (১ম প্রকাশ, ঢাকা-২০০৪), পৃ. ২০০।

১১২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড), (প্রথম সংস্করণ, ঢাকা-১৯৬৪), পৃ. ১৪১।

১১৩. উদ্ধৃত। আবদুল করিম। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: জীবন ও কর্ম (প্রথম সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৪), পৃ. ২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ -পুথির শেষাংশে প্রদত্ত লিপিকরের বিবরণ নিম্নরূপ–

"ইতি- ১১০৯ সন তেরিখ হক মালেক শ্রীজুত জবরদস্ত খাঁ চৌং ওলদে রস্তমখাঁ চৌং সরকার ইসলামাবাদ প্রগলে দিয়াঙ্গ নৌয়ার শ্রীজুত হচ্ছেন আলী খাঁ দেওয়ান শ্রীজুত মোহাসিঙ্গ দেওয়ান লিখীতং হিন শ্রী আবদুল ওহাব এক প্রহর দিন ঘড়িতে পুস্তক সমাপ্ত ॥"[১১৪]

উপর্যুক্ত ১১০৯ সনকে বাংলা সন বলে মনে করলে পুথিটি (১১০৯+৫৯৩)= ১৭০২ খ্রীষ্টীয় সালে লিখিত।এ অভিসন্দর্ভে সংযুক্ত পুথির লিপিকাল হলো আঠারো শতকের মাঝামাঝি।

নিম্নে আলাওল রচিত 'পদ্মাবতী' কাব্যের পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার নমুনা এবং তার পাঠোদ্ধার দেওয়া হলো–

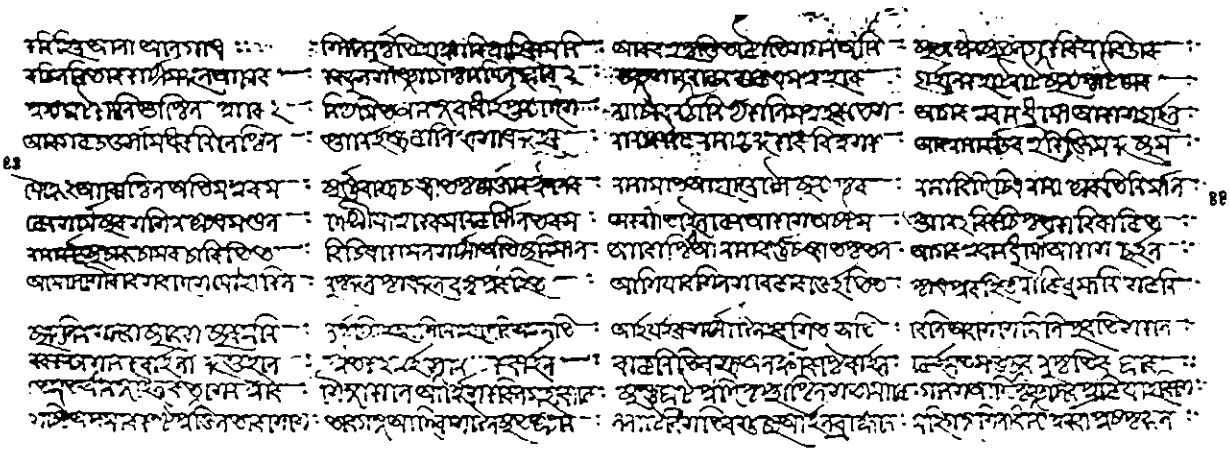

১১৪. উদ্ধৃত। আবদুল করিম। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩।

১১৫. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

"কবিহিন আলাওলে গাএ । সিঙ্গল নৃপতি হাঙ্কারিয়া হীরামনি।
আর বহু পন্ডিতগন জ্যোতিসগন আনি। সুভখেন সুভ লগ্ন করিয়া বিচার।
রচিল বিভার কার্য্য মঙ্গল আচার। করফুল সঞ্জযোগে পান দিল ঘরে।
পঞ্চ শব্দ বাজন বাজেএ মনুহরে। ছাইলেক হাট বাট সুন্য পাটম্বরে।
পূণ্যঘাট কদালি স্তাপিল দ্বারে দ্বারে ॥ নিত্য গিত আনন্দ বাধাই পুন্যদেস।
নাচে বেশ্বা নিত্য কালি মনুহর ভেস ॥ আগর লুবান ধম্মে আকাস ছাইল।
আর গজ চতুর্সমে ধরনি লেপিল। স্তানে ইন্দ্রজালি দ্রসাএ কুহক।
নানা কার্যে নানা ঢঙ্গে করে বিদুসক। আর নানা বর্ন্ন বহু কিত্তিম কুসুম॥
মৈদ্ধে ২ আরোপিল অতি মনুরুম। সুন্ন বস্ত্রে চন্দ্রাতপ মুক্তার ঝালর।
নানা মতে আসাদন কৈল সুন্যপর। নানা বিদি চিত্র নানা মুরতি নির্মল ॥
জেন সর্গে সুর সসি নক্ষত্র মন্ডল ॥ দেখীয়া লুকের মনে জন্মিল ভরম।
অকশ্চাত হৈল জেন আকাশ অষ্টম। স্তানে ২ বিরচি পতাকা বিরাজিত ॥
নানা বর্ন্ন সুচারু চামর চারিভিত ॥ বিচিত্র কোমল সয্যা অতি সুনিম্মল।
আরোপি (আ) ল নানা বর্ন্ন চন্দ্রাতপ তল।। আগর লুবান ধুম্মে আকাশ ছইল।
অমোদ সৌরবে সব দেস মোহাকিল।। নৃপকুল পাত্রকুল বন্দু পুরহিত।
আসিয়া বসিল সবে জার জেই ভিত।। পাত্র পুরহিত নারি ব্রহ্মনি সজনি।
সুকুলিন সদবা সুবেস সুরমনি ।। নৃপগ্রিহে আসি মোহাদেবি অনুমতি ।
আইয়ইর সয্যা কৈল হরসিত অতি।। বেলি অবশেষে যুবতি সকলে।
বরকন্যা স্নান করাইলা কুতুহলে ॥ পৃতক ২ হই স্নান করাইল।
রাজনিতি বস্ত্র অলঙ্কার পৈরাইল ॥ জেই মত মউছব নৃপতির ঘরে।
তেমত আনন্দ হৈল রত্নসেন পুরে ॥ সৈন্দাকালে আদ্দেস করিল মহারাজে।
সুন্যঘট পুদিপ স্থাপিল সভামাজে ॥ গনেস আদি পঞ্চদেব পুজিয়া হরিসে ।
সষ্টি আর মারকন্ট পুজিল তার সেসে।। তবে গন্দ আদিবাস কৈল সুভক্ষনে।
ললাটে বিংসতি বস্তু ছুআইল ব্রাহ্মনে।। মহি গন্দ সিলা ধান্য দুর্ব্বা পুষ্পফল।"[১১৬]

---

১১৬. ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৮০১ সালের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি

কবি শেখ জাহিদ প্রণীত 'আদ্য-পরিচয়' গ্রন্থের ১৮০১ সালের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। যদিও এই গ্রন্থটির রচনা কাল ১৪৯৮ খ্রি,। শেখ জাহিদ প্রণীত আদ্য-পরিচয় গ্রন্থ সম্পর্কে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের তৎকালীন কিউরেটর এ. আর. মল্লিক অভিমত প্রকাশ করে বলেন, "জীবের উদ্ভব ও বিলুপ্তি প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে কাব্যাকারে বিবৃত হইয়াছে। কবির মতানুসারে শূন্য বা অন্ধকার হইতেই বিশ্ব সংসারের প্রকাশ। সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে এই ধারণা রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে বর্ণিত সৃষ্টি তত্ত্বের সহিত বেশ খানিকটা মিলিয়া যায়। নাথপন্থিরাও বিশ্বাস করেন যে, শূন্য হইতেই সমগ্র বিশ্ব উদ্ভূত। এতদসহ আরো লক্ষণীয় যে, নাথগুরু গোরক্ষনাথের জীবন বৃত্তান্ত আদ্য-পরিচয় পুথিতে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল কারণে মনে করা যাইতে পারে যে, কবি শেখ জাহিদ নাথ ধর্মমতের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন।" [১১৭]

শেখ জাহিদ প্রণীত 'আদ্য-পরিচয়' গ্রন্থটি শ্রী মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয়। শ্রী মনীন্দ্রমোহন চৌধুরী এ গ্রন্থের ভূমিকাংশে উল্লেখ করেন, " আদ্য-পরিচয়ের রচয়িতা শেখ জাহিদ। পুথিটি স্বর্গীয় শরৎ কুমার কর্ত্তৃক অবিভক্ত বাঙ্গলার মালদহ হইতে সংগৃহীত হয়। গ্রন্থের অনুলেখক শ্রী নিমাই চরণ দাস (গ্রন্থস্থিত বানান- নেমাই চরন দাস) গ্রন্থটির লিপি কাল বাংলা ১২০৮ সালের। গ্রন্থের আকৃতি প্রাচীন তুলট কাগজে গ্রন্থটি লিখিত। গ্রন্থের পাতাগুলি কালো প্রভাবে মলিন, প্রান্ত ভাগ স্থানে স্থানে ছিন্ন প্রায়। হস্তাক্ষর ঘন সন্নিবিষ্ট । বহিরঙ্গের খুঁটিনাটি বিচারে পুথিটি প্রাচীনতার দাবী রাখে। " [১১৮]

'আদ্য-পরিচয়' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার সম্পর্কে মরহুম মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন, " বর্তমান সময় (১৯৭৯) হইতে প্রায় ষাট বছর আগে ইংরেজ রাজত্বের শেষের দিকে, অন্যান্য বাংলা ও সংস্কৃত পুস্তকের একগাদা পাণ্ডুলিপির সহিত বক্ষ্যমান পুস্তকের একখানা পাণ্ডুলিপি ভারতের পশ্চিম-বঙ্গে অবস্থিত 'মালদহ' জেলা হইতে পরলোকগত শরৎকুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া অধুনাতন বাংলাদেশস্থ রাজশাহী জেলার 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও যাদুঘরের' পুথিশালায় সংরক্ষিত হইয়াছিল। ---------- ------- অতঃপর, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধের দিকে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার রাজশাহী সরকারী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক মরহুম মীরজাহান সাহেবের স্কন্ধে অর্পিত হয়। তিনি স্থানীয় লোকনাথ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড-পণ্ডিত শ্রী যুক্ত মনীন্দ্রমোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ মহোদয়ের সহায়তায় যাদুঘরের অবিবরিত পাণ্ডুলিপি গুলির একটি বিবরণী পুস্তক করাইতে গিয়া পূর্ব সংগৃহীত স্তূপীকৃত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্য হইতে আদ্য পরিচয়ের পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেন।" [১১৯]

১১৭.উদ্ধৃত। শ্রী মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী, কাব্যতীর্থ। আদ্য পরিচয় (শেখ জাহিদ),(১ম প্রকাশ, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী - ১৯৬৪)পৃ.১।

১১৮. শ্রী মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী, কাব্যতীর্থ। পূর্বোক্ত, পৃ.২।

১১৯. মুহম্মদ এনামূল হক সম্পাদিত। আদ্য-পরিচয়, শেখ জাহিদ প্রণীত(১৪৯৮), (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৭৯) পৃ. ১-২।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু আলোচ্য পাণ্ডুলিপির মূল হস্তলিপি পাওয়া যায়নি । পাওয়া গিয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি । উক্ত পাণ্ডুলিপির বেশ কিছু ফটোকপি এবং তার পাঠোদ্ধার নিচে উপস্থাপন হলো।

শেখ জাহেদ প্রণীত 'আদ্য-পরিচয়' (১৪৯৮) পুঁথির পাণ্ডুলিপির চিত্রানুলিপি

কালজ্ঞাপক শ্লোকবিশিষ্ট পদ : পুঁথির পৃষ্ঠা ২

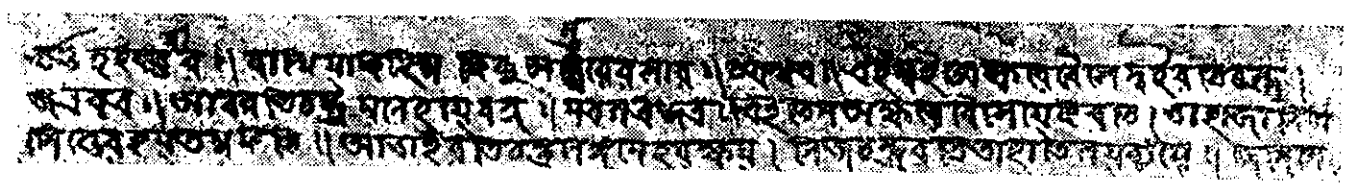

পুঁথির পৃষ্ঠা ৪

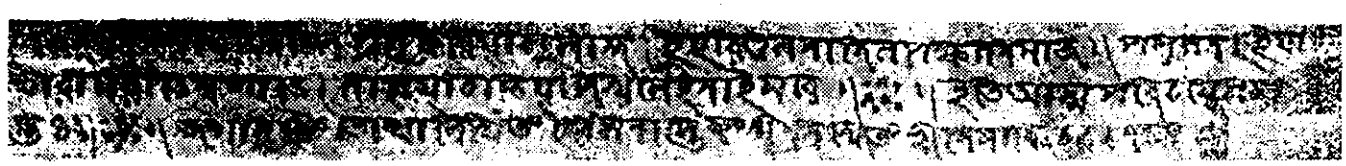

পুঁথির পৃষ্ঠা ১৪

১২০. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত। পূর্বোক্ত, ফটোকপি সংযোজন।
১২১. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত। পূর্বোক্ত, ফটোকপি সংযোজন।
১২২. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত। পূর্বোক্ত, ফটোকপি সংযোজন।

Dhaka University Institutional Repository

১।

কহিল সকল কথা হৃদয়ে উতারি ॥
কিঞ্চিৎ কহিমু সেই কথা অনুসারি।
ব্রহ্মার আনন জথ রাবণের করে
গুনিলে জথ হএ সহস্র উপরে ॥
এত লোকের ২ মাঝে করিলো প্রচার
পয়ার প্রবন্ধে ৩ কহি আঁতুমা বিচার
জাহিদ কহে চিত্তে করি আঁছো সার
সুহৃদ ২ চরণ বিনে গতি নাঞি আর।

২।

তত্ত্ব হইব উদার।
রাখিয়া কহিমু কিছু অন্তরের সার।
{চ এ খ এ ॥ এই দুই অক্ষরে বৈসে দুই রতি চন্দ্র।
{জ এ ব এ ॥ আধরতি চন্দ্র মনে হয় ধন্ধ॥
{ম এ গ এ জ এ ॥ এই তিন অক্ষরে বইসে এক রতি
তাহা জানিলে পিণ্ডের হএত মুকতি ॥
আড়াই রতি চন্দ্র সঙ্গমে হএ খয় ।
নিজ চন্দ্র রতি তাহাতে লয় ব্যয় ॥

৩।

পৃথিবী রচিল প্রভু করিয়া সুসাজ ।
ইহার তুলনা দিল পশু-পক্ষী মাঝ ॥
পক্ষীগণ হৈআ তারা মরা ডিম্ব পাড়ে।
লাড়িয়া-চাড়িয়া দেখ সেহি নাহি মরে ॥

ইতি আদ্য পরিচয় সমাপ্ত
যথা দৃষ্টং তোথা লিখিতং দোস নাস্তিকং।
লিখিতং শ্রী নেমাঞি চরন দাস ॥

Dhaka University Institutional Repository

শেখ জাহিদ প্রণীত কাল জ্ঞাপক শ্লোক বিশিষ্ট পদ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, গ্রন্থটি ১৪৯৮ সালে রচিত। কারণ বাঙালী কবিদের রচনায় প্রতীকী বা অনির্দেশক সংখ্যা শব্দ যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে; এ গ্রন্থটিও তার ব্যতিক্রম নয়। গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কে উক্ত প্রতীকী শব্দগুলোর যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

'ব্রহ্মার আনন-৪
রাবণের কর- ২০

এই সংকেত থেকে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা হলো ৪২০। এর চেয়ে এক সহস্র বেশি অর্থাৎ (১০০০+৪২০)=১৪২০। এই ১৪২০ কে শকাব্দ ধরলে এবং সাথে ৭৮ যোগ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া তা হলো (১৪২০+৭৮)= ১৪৯৮খ্রী.।'[১২৩]

এভাবে পুস্তক বা গ্রন্থ রচনার প্রতীকী সংখ্যার ব্যবহার সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া বলেন," মধ্যযুগের বাঙালি মনে প্রতীকীকৃত সংখ্যাশব্দ ও অনির্দেশক সংখ্যাশব্দ ব্যবহারের মোহ দীর্ঘকাল যাবৎ বেচে থাকার কারণ হল, এগুলো তাঁদের অভিজ্ঞতা সমূহ সংগঠিত ও সুশৃংখল করতে এবং তাঁদের পথ প্রদর্শন করতে সহায়তা করেছিল।" [১২৪]

পরিশেষে বলা যায়– ঐতিহাসিক যুগে এসে বাংলা লিপির বিকশিত ব্যবহার লক্ষণীয় এবং এই সময়ের শিলালিপি, তাম্রলিপি, ভূর্জপত্র ,তালপত্র ও তুলট কাগজ প্রভৃতিতে বাংলা লিপিব ব্যবহার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এ কালের লিপির আকার বৈচিত্র্যের সঙ্গে এই ব্যবহার বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ করলে মধ্যযুগে বাংলা লিপির শক্তির নির্দশন ও বৈচিত্রের বিভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। বাংলালিপির এই আকার ও ব্যবহার গত বৈচিত্র্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১২৩. শ্রী মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী, কাব্যতীর্থ। আদ্য পরিচয় (শেখ জাহিদ),(১ম প্রকাশ, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, রাজশাহী, ১৯৬৪) পৃ.৬।

১২৪. ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া। বাংলা অনির্দেশক সংখ্যা শব্দ, (প্রথম প্রকাশ, ঢাকা-১৯৯৯), পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

- মুসলিম শাসন আমলে বাংলা ও অন্যান্য লিপির ব্যবহার।
- বাংলা গ্রন্থ রচনায় আরবী লিপির ব্যবহার।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসনামলে বাংলা ও অন্যান্য লিপির ব্যবহার

মুসলিম শাসন আমলে মুসলমানরা আরবী লিপি ও আরবী ভাষার ভিত্তিতে বাংলা লিপি ও বাংলা ভাষার সংস্করণ, উন্নয়ন ও সরলীকরণ করেন। মুসলিম শাসন আমলে মুসলমানেরা বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপির গবেষণায় যে বিচার, বিবেচনা ও প্রতিভার পরিচয় দেন, তা তিনটি ধারায় বিকশিত হয়।

উক্ত ধারা তিনটি সম্পর্কে ড. এস. এম. লুৎফর রহ্মান এর গবেষণা থেকে জানা যায়,–

'১. জ্যোতিষ বিদ্যাচর্চার অমুসলিম চিন্তাধারার সমান্তরাল মুসলিম চিন্তাধারার প্রকাশ এবং মুসলিম জ্যোতিষতত্ত্ব ও সাহিত্যের সৃষ্টি। এতে আরবী ,বাংলা ও সংস্কৃত অক্ষর এবং পরিভাষার মধ্যে সমন্বয় করার জন্য অতিশয় জটিল ও কঠিন গবেষণা-দক্ষতার পরিচয় দিতে হয়।

২. আরবী ভাষার ও আরবী লিপির ভিত্তিতে বাংলা ভাষার ও বাংলা লিপির সংস্কার, উন্নয়ন ও সংক্ষেপন।

৩. আরবী, ফারসী, উর্দু ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদকালে সঠিক বানান ও উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী লেখন প্রণালীর উদ্ভাবন। আর এ কাজে আরবী ও বাংলা লিপির পূর্ণতা-অপুর্ণতার সঠিক মূল্যায়নসহ গ্রহণ,বর্জন কিংবা নতুন চিহ্নাদি সৃষ্টি'।[১২৫]

ড. রহ্মান আরো বলেন , 'মুসলমানরা বিশেষ করে মুঘল যুগে বাঙালীর মূল উচ্চারণের নিরিখে বাংলা হরফ বা বাংলা বর্ণমালাকে আরবী বর্ণমালার সঙ্গে সমীকরণ করে বাংলা বর্ণমালার সংকোচন করেন'।[১২৬]

১২৫. ড. এস.এম. লুৎফর রহমান। ব্রিটিশ পূর্ব আমলে বাঙালা ভাষার গবেষণায় বিস্ময়কর মুসলিম অবদান: আঠারো হরফে বাঙালা লেখন। দৈনিক ইনকিলাব, ১লা বৈশাখ-১৪০৮।

১২৬. ড. এস.এম. লুৎফর রহমান। ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর উপস্থাপিত সমীকরণ নিম্নরূপঃ "

ا =আ ب =ব ط, ت =ত ث, س, ص =ছ ظ, ز, ذ, ج =জ ه, ح =হ خ =খ ض, د =দ =x =x غ =গ ف =ফ	ک ق =ক ل =ল م =ম ن =ন و =উ =x =x ی =ই	মন্তব্যঃ এ সারণিতে স্পষ্ট রূপেই আরবী আটাশটি হরফের বাংলা হরফের প্রতিরূপে আঠারোটি হরফই পাওয়া যায়। এর মধ্যে স্বরবর্ণ তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণ পনের টি।

এগুলো বাংলা হরফের দিক থেকে সাজালে এরূপভাবে দেখানো যায়।

"স্বরবর্ণ"

অ= x আ= ا ই= ی ঈ= x উ= و ঊ= x	ঋ ঋ = x = x এ = x ঐ = x ও = x ঔ = x	মন্তব্যঃ অনুস্বার ও বিসর্গকে ব্যঞ্জনের মধ্যে দেখানো হয়েছে।

"ব্যঞ্জনবর্ণ"

ক= ق, ک খ= خ গ= غ ছ= ث. س (ঘ,ঙ,চ=) জ= ض, ذ, ظ (ঝ,ঞ,ট,ঠ,ড,ঢ,ণ=) ত= ت, ط থ=x দ= د, ض	(ধ= x) ন= ن (নুন) (প=) ফ= ف (ফে) ব= ب (বে) (ভ=) ম= م (মিম) (য= x) র = ر (রে) ল = ل (লাম) (ব= x) (শ,ষ= ش) স = (শিন) হ = ح, ه (বড় হে)	মন্তব্যঃ এ তালিকায় ড়,ঢ়,য়,ৎ, ং,ঃ এবং ँ (চন্দ্রবিন্দু) কে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ ওগুলো বাঙালা বর্ণমালার আধুনিক সংযোজন গুরুত্বহীনও বটে।

"১২৭

১২৭. ড. এস.এম. লুৎফর রহমান। বাঙালা ভাষায় আরবী-ফারছী-উরদু শব্দের সংস্কৃতায়ন ও তার পরিণাম। সাহিত্য পত্রিকা (৪৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-২০০২), পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে মুসলিম গবেষকরা আরবী হরফ ভিত্তিক বাংলা ও বাংলা হরফ ভিত্তিক আরবী লিপির সমন্বয়মূলক মাত্র পনেরটি ব্যঞ্জনবর্ণ ও তিনটি স্বরবর্ণ মিলে আঠারটি হরফে বাংলা হরফমালা তৈরি করেন।

এ সর্ম্পকে গবেষক বলেন "আরবী হরফের বাঙালা Transliteration এর প্রতি নজর দিলে দেখা যায়, দুটো 'হেকে বাঙালা একটা 'হ' দিয়েই প্রকাশ করা হয়েছে। একই ভাবে 'তে' এবং 'তোয়'বর্ণদ্বয় ও বাঙ্গালা 'তোয়' দিয়ে তর্জমা করা হয়েছে। তারপর 'ছে', 'ছিন','ছোয়াদ' বর্ণ তিনটিকেও একমাত্র বাঙালা হরফ 'ছ' দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। 'জিম' হরফের বিকল্প রূপে নেওয়া হয়েছে বাঙালা 'য' কে। আর 'জাল', 'জে'এবং 'জোয়' হরফ তিনটির বদলে নেওয়া হয়েছে একটি মাত্র বাঙালা 'জ'। অন্যদিকে 'দাল'-এর বদলে 'দ' বেছে নেওয়া হলেও 'দোয়াদ'-ব এর বদলে বেছে নেওয়া হয়েছে বাঙালা 'দ' কে। দুটো 'কাপ'-এর বদলে নেওয়া হয়েছে একটি বাঙালা হরফ 'ক'। নজর না করে পারা যায় না যে, এ চারটে 'লামালিপ','হামজা' ও 'ইয়া'বাঙালা বিকল্প রূপে দেখানো হয়নি।'ইয়ের'ও নয়।"[১২৮]

এর ফলে স্বল্প হরফে অতি অল্প সময়ে বাংলা গ্রন্থ রচনা এবং আরবী গ্রন্থের সহজ-সরল বঙ্গানুবাদ সম্ভব হয়।

বাংলা গ্রন্থ রচনায় আরবী লিপির ব্যবহার

মুসলিম আমলে আরবী লিপির সাহায্যে বাংলা গ্রন্থ রচনারও প্রমাণ পাওয়া যায় । 'আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ আরবী হরফে লেখা ৪৯টি বাংলা পুথি আবিষ্কার করেন এবং সেগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন।'[১২৯] আরবী লিপির সাহায্যে বাংলা গ্রন্থ রচনার পরিমাণ মোটেই কম নয়, এমনকি প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় গ্রন্থও আরবী লিপির সাহায্যে লিখিত হয়েছিল।

এ সম্পর্কে ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম অভিমত প্রকাশ করেন,"আরবী হরফে লেখা প্রচুর বাংলা পুথি সংগৃহীত হয়েছে এবং সেগুলো বর্তমানে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। শুধু ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ নয়, প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাব্যও আরবী হরফে লেখা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিপিকর-ই বাংলা পুথি দেখে আরবী হরফে লেখেন। একটি বার মাসির পুথির শেষে লিপিকর লিখেছেন–

বার মাস লেখা হৈল আর লিখব কি
পূর্বে ছিল বাঙালা করিলাম আরবী।

(ঢাবি ৩২৫-৩১/৬৯৯-৭০৫)*"[১৩০]

---

১২৮. ড. এস.এম. লুৎফর রহমান। ব্রিটিশ পূর্ব আমলে বাঙলা ভাষার গবেষণায় বিস্ময়কর মুসলিম অবদান: আঠারো হরফে বাঙলা লেখন। পূর্বোক্ত।

১২৯. আবদুল করিম। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

১৩০. ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা পুথি আরবী হরফে লেখা কালে প্রচুর ভুল ভ্রান্তি ঘটে থাকে।এ সম্পর্কে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেছেন ,"আরবী হরফে শুদ্ধরূপে বাঙ্গালা লেখা সম্ভব নহে" ।[১৩১]

মুসলমান কবিরা যে হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা করেছিলেন, সে বিষয়ে বিভিন্ন বিদ্বান ব্যক্তির বক্তব্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে মুহম্মদ এনামুল হক বলেন,"এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিক হইতে স্বল্প সংখ্যক বাঙালি মুসলিম কবি ধর্ম- বিষয়ে বাংলা ভাষায় পুস্তক লিখিতে যাইয়া বাংলা অক্ষরের পরিবর্তে আরবী হরফ পরিবর্তনের চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই সময়ের মহম্মদ জান নামক এক কবি 'নামাজ মাহাত্ম্য' নামক এক পুস্তক ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে লিখিতে গিয়া ভূমিকায় বলিয়াছেন :

আর এক কথা কহি শুন বন্ধুজন।
আরবী অঙ্গুলে যদি বাংলা লিখন ॥
বুঝি সুঝি কার্য-কৈলে পাপ ঘোরতর।
সত্তর নবীর বধ তাহার উপর ॥
(নামাজ মাহাত্ম্য)

'নামাজ মাহাত্ম্য' গ্রন্থের ছয়খানা পাণ্ডুলিপির মধ্যে দুইখানি আরবি হরফে পাওয়া গিয়াছে, অবশিষ্টগুলি বাংলা অক্ষরে অনুলিখিত। এ পর্যন্ত ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সন- তারিখযুক্ত কোন বাংলা পুঁথির আরবি অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে আলাওলের (সপ্তদশ শতাব্দী) পদ্মাবতীর একখানি তারিখহীন পাণ্ডুলিপি আরবী হরফে পাওয়া গিয়াছে; তাহা কিছুতেই দেড়শত বৎসরের পূর্ববর্তী অনুলিপি নহে।"[১৩২]
এ জাতীয় গ্রন্থ সম্পর্কে বলা যায়,' মুঘল আমলে (১৫৭৬-১৭৫৭) থেকেই বাংলা সাহিত্যে ইসলামী শরা-শরীয়ত সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনার একটি ধারা সৃষ্টি হয়েছিল।'[১৩৩]

অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়' গ্রন্থে আরবী হরফ লেখা একখানি বাংলা পুথির নমুনা প্রদর্শিত হয়েছে'।[১৩৪]

---

১৩১. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬ ।
১৩২. উদ্ধৃত। ড. এস.এম. গোলাম কাদির। সিলেটি নাগরী লিপি ভাষা ও সাহিত্য(প্রথম প্রকাশ বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯৯), পৃ. ৩৩-৩৪।
১৩৩. ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া সম্পাদিত। হেয়াত নন্দন নজর মামুদ প্রণীত। তৌহিদ ঈমান,(প্রথম প্রকাশ ঢাকা-১৯৯৯), পৃ. ১৬।
১৩৪. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে আগে বাংলা বিবরণ ও পরে আরবী লিপি প্রদর্শিত হয়েছে।

" বি বি আয়েশার আগে পুছিত লাগিলা
কি কারনে শুনিতেছি কান্দনের রোল
কোন হেতু লোক সবে করে কোলাহল
তবে আয়েশায শুনি কহিতে লাগিল।
তোমার কারনে সবে কান্দিতে লাগিল
সমাজেতো নমাজ করিতে না পারিল।
অধিক ব্যাধিহেন সকলে জানিলা
তে কারনে উচ্চ স্বরে কান্দে সর্বজন
উমত হইয়া সবে করেন তো রোদন।" [১৩৫]

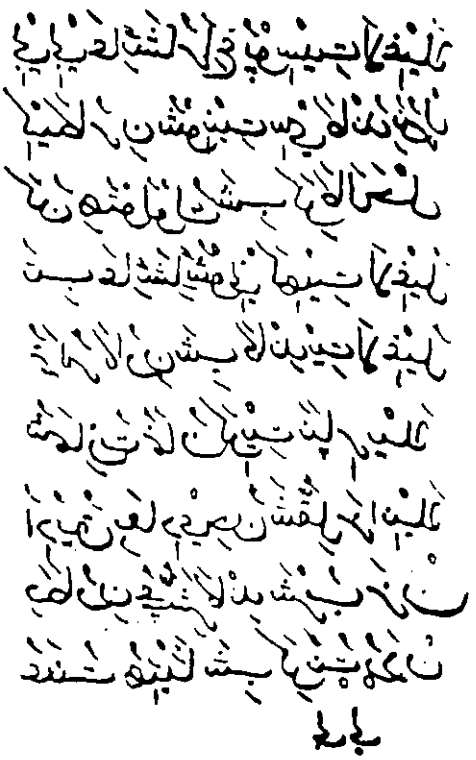

১৩৫. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭ ।
১৩৬. উদ্ধৃত। ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে জনাব শেখ চাঁদ রচিত 'তালিবনামা' গ্রন্থ থেকে আরবী-ফারসী হরফে লেখা একখানি পৃষ্ঠার নমুনা ও তার আধুনিক বাংলা পাঠ দেওয়া হলোঃ-

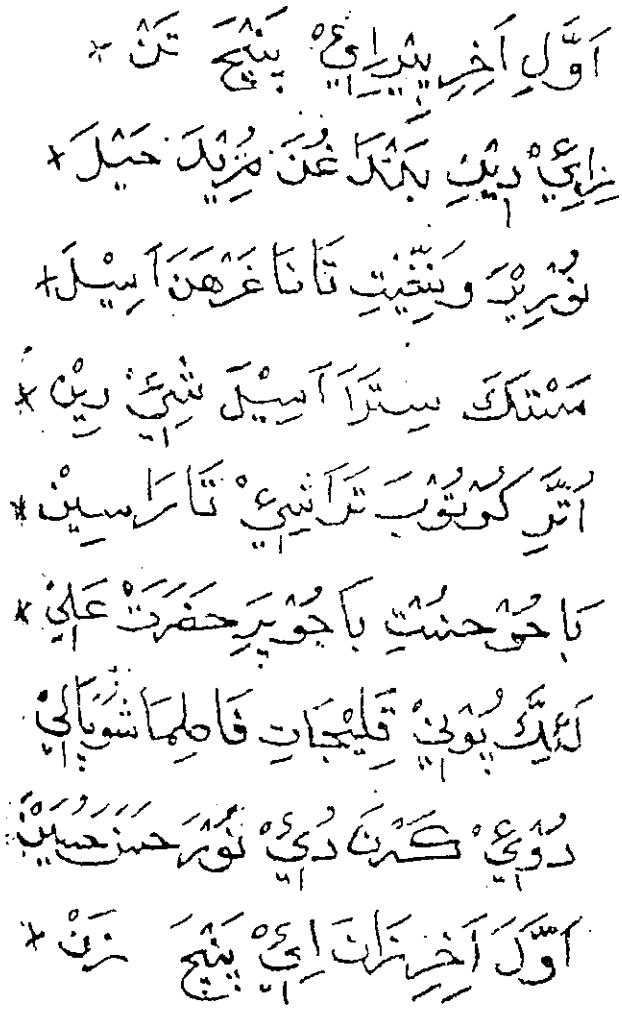

১৩৭. শেখ চাঁদ। 'তালিবনামা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, বাংলা একাডেমী পাণ্ডুলিপি থেকে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ালে আখেরে পির এই পঞ্চ তন।
জেইদিন বান্দা গণ মুরিদ হইল।
নুরের অঙ্গেতে তানা গরহানা আছিল।
মস্তক সিতারা আছিল সেইদিন।
উত্তে কুতুব তারা সেই তারা ছিন।
রাহু হন্তে বাজু পরে হজরত আলি।
লইকা পুনি কলিজাতে ফাতেমা সুপালি।
দুই কর্ণ দুই নুর হাসান হোসাইন।
আওয়াল আখেরে জান এই পঞ্চ জন।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে বালক ফকির রচিত 'আজির চৌতিশা' পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার নমুনা এবং তার আধুনিক বাংলা পাঠ দেওয়া হলোঃ-

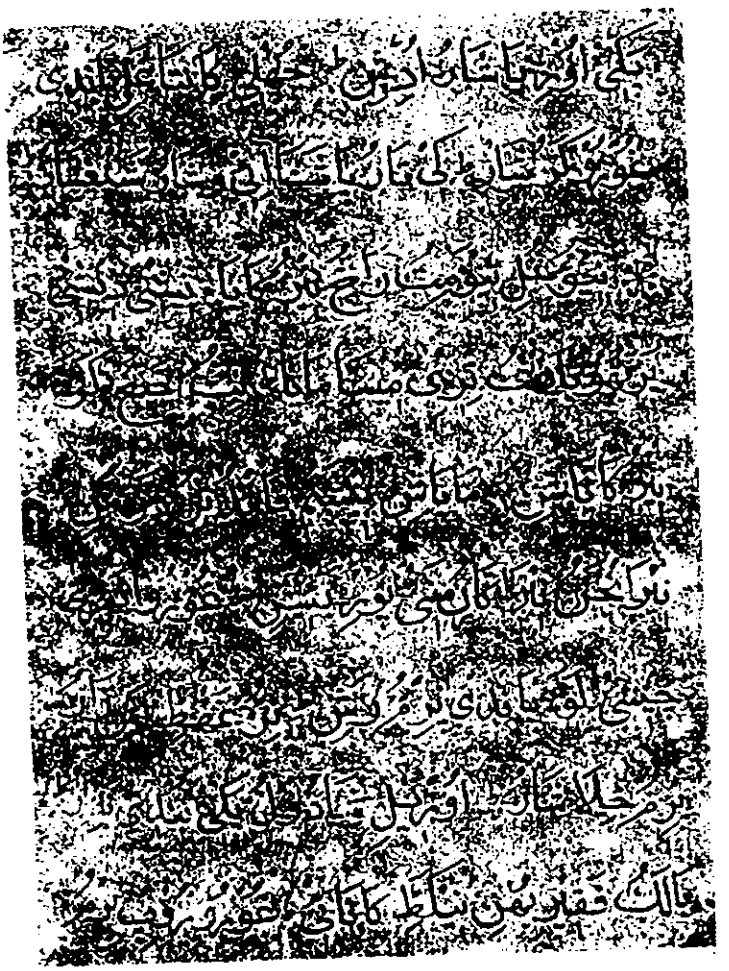

১৩৮। বালক ফকির। আজির চৌতিশা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, বাংলা একাডেমীর পাণ্ডুলিপি থেকে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

'পাখি উরে বাসার উদ্দেসে।
ঝুলি কান্তা গলে বান্দি গুরু কর সার।
কি তর বসনে এই অসার সংসার।
নিয় (ঞ) বোলে নিয়মিত রাখ নিজ কায়া।
নিশি দিসি পর্ভু ভাব তেজি মিছা মায়া।
নিত্য জঙ্গ কর নিজ কায়া সনে।
মায়া সে বিসম ফান্দ তেজ দর মনে।
নিরঞ্জন নিরাকার মনিপুরে বইসে।
গুরু ভজি চিনি লয় বান্দি প্রেম রসে।
নিজ ঘটে আসে জার প্রেম খেলা সার।
উরিলে সাদুল পাখি বন্দি নাহি আর।
বালক ফকিরে ভনে নিকটে কানাই।
গুরুরূপে প্রেম----------।'

বাংলা গ্রন্থ রচনায় আরবী লিপির যে ব্যাপক ব্যবহার হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সম্পাদিত এবং অনুবাদিত 'A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts in Munshi Abdul Karim`s Collection গ্রন্থে। এ গ্রন্থে Muhammad Fasih নামক একজন লেখকের একটি পুথি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।এ সম্পর্কে বলা হয়েছে , " No title given in the manuscript but may be called a prayer in 30 Arabic characters.

আরবির এ তিরিশ য়ক্ষরে করি ভার ।
মোনাজাত করিলাম গোচরে আল্লার।
একেক অক্ষর প্রতি চতুর পদ বন্দে
মোহাম্মদ ফসিহ কহে পয়ার জে ছন্দে ॥" [১৩৯]

এ বইতে সৈয়দ হামজা রচিত 'আমীর হামজার কিস্‌সা'র পুথির পরিচয় পাওয়া যায়।

এ পুথি সম্পর্কে বলা হয়েছে– "The conquests and miraculous life – story of Hamza uncle of prophet Muhammad . Fairly recint. Written in Arabic Characters in an immature hand . Size 16×9 . Lines 10-11. Leaves 17." [১৪০]

---

১৩৯. Syed Sajjad Hussain Edited and Translated. A Descriptive Cartalogue of Bengali Manuscripts in Munshi Abdul Karim`s Collection, Dhaka-1960. P.-08.
১৪০. Syed Sajjad Hussain Edited and Translated. পূর্বোক্ত, পৃ.-১০।

Dhaka University Institutional Repository

বইটি যে আমির হামজা রচিত, তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায় নিম্নোক্ত পঙক্তিতে–

"জার জে বাসাও তারা খোসালেতে রহে ।
হামজার গোলাম হামজা এই বাত কহে ॥" [১৪১]

এ বইটিতে মুসলিম আমলের শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল রচিত তোহফা পুথির পরিচয় পাওয়া যায়; যা আরবী হরফে অনুলিখিত হয়েছিল। জনাব আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এই পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কার করেন। 'তোহফা' পুথির আলোচিত বিষয় হলো–
'মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ও ধর্মীয় কাজ সম্পাদিত হয়।'[১৪২]
এই পুথি সম্পর্কে বলা হয়েছে –"Written in Arabic characters on machine-made paper blue in colour. 50-60 years old. Size 8 6 Incomplete.Leaves not numbered."[১৪২]
অর্থাৎ ' প্রতিটি কারখানার তৈরী নীল কাগজে আরবী হরফে লিখিত। ৫০-৬০ বছরের পুরানো। পুথিটি ৮ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, যা অসম্পূর্ণ। পৃষ্ঠা সংখ্যা গণনা হয়নি।'
এই পুথির শুরু হয়েছে ,

"শাহাদাত কালিমা মুখেতে না আসিব।
দুই দন্ড বেলা যদি হইল উদিত।
এশায়ক নমাজ পড়িব প্রতিনিত।"[১৪৩]

এই পুথির শেষ অংশ ঃ

"শ্রীযুত ইছুপ গদা মহামন্ত অলি

শ্রীযুত ছোলেমান সুপন্ডিত দাতা ॥"[১৪৪]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, মুসলিম আমলে বাংলাদেশে আরবী হরফে বাংলা পুথি লেখার প্রবণতা ছড়িয়ে পড়েছিল।

---

১৪১. Syed Sajjad Hussain Edited and Translated. পূর্বোক্ত, পৃ.-১০।
১৪২. Syed Sajjad Hussain Edited and Translated. পূর্বোক্ত, পৃ.-১৮৬।
১৪৩. Syed Sajjad Hussain Edited and Translated. পূর্বোক্ত, পৃ.-১৮৬।
১৪৪. Syed Sajjad Hussain Edited and Translated. পূর্বোক্ত, পৃ.-১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

- বাংলাদেশে ভাওয়াল লিপির পরিচয়।
- সিলেটী লিপির উদ্ভব ও ক্রম বিকাশ।
- সিলেটী লিপি সম্পর্কে বিভিন্ন মত।
- সিলেটী লিপির ব্যবহার-বৈচিত্র্য।
- বাংলা গ্রন্থ রচনায় সিলেটী নাগরী লিপির ব্যবহার।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ভাওয়াল লিপি পরিচয়

ভাওয়াল আধুনিক বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার উত্তর দিকে গাজীপুর জেলায় অবস্থিত। জনাব যতীন্দ্রমোহন রায় তাঁর 'ঢাকার ইতিহাস' গ্রন্থে ভাওয়ালের সীমা সম্পর্কে বলেছেন , "উত্তর সীমা ময়মনসিংহ জেলা (কাওরাইদের নদী); পূর্ব সীমা লাক্ষ্যা নদী; মহেশ্বরদী ও সোনারগাঁও; দক্ষিণ সীমা বুড়িগঙ্গা নদী; পশ্চিম সীমা তুরাগ নদী ও চন্দ্র প্রতাপ।"[১৪৫]

শত শত বছর ধরে এ অঞ্চলে চণ্ডাল সম্প্রদায় বসবাস করে আসছে। তারা নিজেদের মধ্যে এক ধরনের লিপি ব্যবহার করতো , এ লিপিকেই ভাওয়াল লিপি বলে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দেও এই লিপিতেই লেখা পুথি ভাওয়ালের চণ্ডালদের অনেক পাঠ করতে পারতো বলে জানা যায়।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন 'এই লিপিকে 'চাষাঢ়ে' লিপি বলে নামকরণ করেছেন'।[১৪৬]

পৃথিবীর নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উত্থান-পতনের মধ্যেও পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে নিজেদের বিলীন না করে ভাওয়ালের চণ্ডাল সম্প্রদায় কীভাবে তাদের নিজেদের ব্যবহৃত লিপিতেই পুঁথি লেখতো তা বিস্ময়কর। এ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের বৃহৎ বঙ্গের ১ম খণ্ডের অংশ বিশেষ স্মরণযোগ্য, "তাহারা নানা দেশের সংস্পর্শে আসিয়া যুগে যুগে রীতি নীতি ভাব ভাষার অনেক রূপ পরিবর্তন করিয়া থাকেন, এমনকি অনেক সময়ে ভিন্ন দেশাগত বিজয়ী বীরদের অত্যাচারে কখনও কখনও সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা একেবারে বিলুপ্ত হন, নতুবা দেশান্তরী হইয়া আত্মরক্ষা করেন। কিন্তু সমাজের নিম্ন শ্রেণী সেই ঝড়ের উৎপাতে একেবারে নষ্ট হয় না। শাল, তমাল ভাঙ্গিয়া প্রভুঞ্জন লীলা করেন, কিন্তু তিনি শ্যামা দূর্ব্বাদলের একটিও শিখা ভাঙ্গেন না। দেশের প্রাচীনতম আচার, নীতি এমনকি শিক্ষা-দীক্ষা, কলাবিদ্যা এ সমস্তই দেশের নিম্ন শ্রেণীর কুটিরে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকে, এ দেশে যে তাহা হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আমরা পরে দিব। এই নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা জাতীয় প্রাচীন সম্পদের অন্তঃপূরের দূর্গা স্বরূপ।"[১৪৭]

ভাওয়ালের লিপি সম্পর্কে যে গ্রন্থখানিতে প্রথম আলোচিত হয়েছে তা হলো নবীনচন্দ্র ভদ্রের ভাওয়ালের ইতিহাস'। নবীনচন্দ্র তাঁর এ গ্রন্থে ভাওয়ালের লিপি সম্পর্কে লিখেছেন, "বহুদিন গত হইল, ভাওয়ালের মঘীর মাঠের সম্মুখে কতকগুলি অক্ষরযুক্ত এক খণ্ড তামার পাত পাওয়া গিয়াছিল। তত্রত্য ভূতপূর্ব জমিদার স্বর্গীয় মহাত্মা গোলক নারায়ণ রায় চৌধুরী তাহা আনাইয়া ঐ অক্ষরগুলি পড়াইবার জন্য অনেক যত্ন করাইয়াছিলেন; কিন্তু কেহই তাহা চিনিতে না পারিয়া ঢাকায় কোন বিজ্ঞ ইংরেজের নিকট পাঠান, তথায়ও কোন কোন ব্যক্তি পাঠ করিতে পারেন না। তৎপর তাহা কলিকাতায় প্রেরিত হয়। কিন্তু সেখানেও কেহ তাহা পাঠ করিতে না পারায় তাহা ইংল্যান্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

---

১২৬. যতীন্দ্রমোহন রায়। ঢাকার ইতিহাস (কলকাতা ২য় সংস্করণ ২০০০) পৃ.৩।

১২৭. ড. দীনেশ চন্দ্র সেন। বৃহৎ বঙ্গ(প্রথম খন্ড, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ) পৃ.-৩৩।

১২৮. ড. দীনেশ চন্দ্র সেন। পূর্বোক্ত পৃ.-৩।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে যাহারা চাষানগরী অবগত আছে, তাহাদিগকে এ তাম্র শাসন প্রদর্শন করা হইয়াছিল না। ভাওয়ালে এখন ও চাষা নাগরী চণ্ডাল জাতির মধ্যে কেহ্ কেহ্ অবগত আছে, তদ্বারা বিলক্ষণ অঙ্ক গানা ও হিসাবাদি করিয়া থাকে, চাষা নাগরীতে লিখিত কতিপয় পুস্তক তাহাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়।"[১৪৮]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ভাওয়ালের মঘীর মাঠের সম্মুখে প্রাপ্ত তাম্র শাসন ঐ অঞ্চলের চণ্ডাল সম্প্রদায়ের লোকদেরকে পাঠোদ্ধার করতে দিলে হয়তো তারা সফল হতেন। ভাওয়ালের লিপির পাঠোদ্ধার হলে, এবং তাদের সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারলে বাংলা সাহিত্যের অনেক নতুন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যাবে।

১৪৮. ড. দীনেশ চন্দ্র সেন। পূর্বোক্ত পৃ.-৩।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটী লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশঃ

সিলেটী নাগরী লিপিতে একদিন সৃষ্টি হয়েছিল উন্নতমানের সাহিত্য, মানবিক প্রেমের উৎস স্রোত । কিন্তু বাস্তবতার কারণে সিলেটী নাগরী লিপি থমকে দাঁড়ায়। সিলেটি নাগরী লিপির বহুল প্রচলন দেখা যায় খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকে। এ সময় ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য হযরত শাহজালাল (রাঃ) সিলেটে আগমন করেন। ধর্ম প্রচার ও সাহিত্য চর্চার জন্য এ লিপির ব্যপক ব্যবহার দেখা যায়। ধারণা করা হয়, খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিহারযুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থান থেকে যে সকল মুসলমান ফৌজ এসেছিলেন তাদের এবং অন্যান্য স্থানের নবাগত মুসলমানদের জন্য সিলেটী নাগরী লিপির সৃষ্টি হয়।

প্রায় একশ পঁচিশ বছর আগে সর্বপ্রথমে সিলেটী নগরী লিপিতে পুঁথি ছাপা হয়। সিলেটের ইসলামিয়া, প্রেস সারদা প্রেস ও কলকাতার জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসে নাগরী ভাষার পুঁথি ছাপা হতো । গ্রাম্য মুসলমানরা সাধারণতঃ নাগরী লিপির সাথে পরিচিত ছিল এবং কেবল নাগরী ভাষায় নাম লিখতে পারতো। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও দলিলপত্রে নাগরী লিপির স্বাক্ষর দেখা যায়।

এই সিলেটী নাগরী লিপির বর্ণের সংখ্যা ছিল ৩২ টি।
সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করে পর্যায়ক্রমে তার বাংলা প্রতিরূপ দেওয়া হলোঃ-

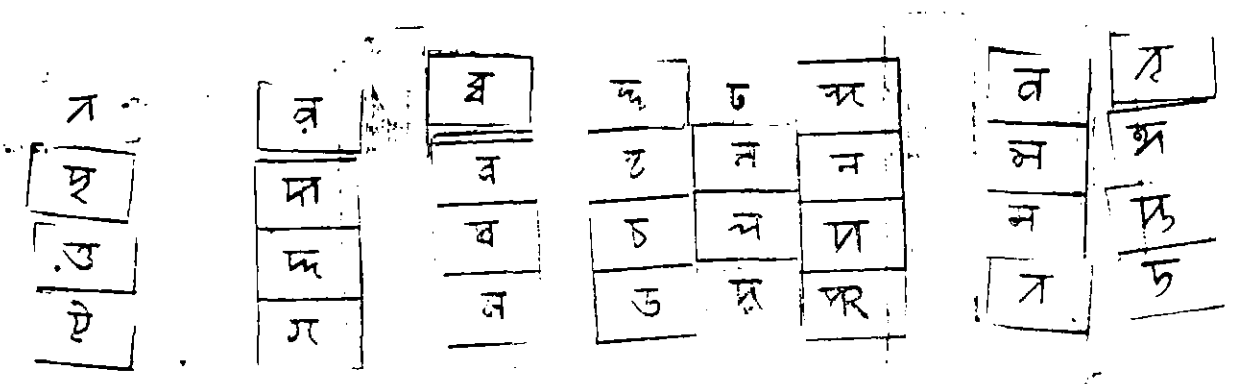

অ	ক	চ	ট	ত	ন	ভ	ড়
ই	খ	ছ	ঠ	থ	প	ম	শ
উ	গ	জ	ড	দ	ফ	র	হ
এ	ঘ	ঝ	ঢ	ধ	ব	ল	
ও							

১৪৯. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী। সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, (ঢাকা-১৯৬১), পৃ. ১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

তার মধ্যে স্বরবর্ণ ৫ টি যথা- 'আ, ই, উ, এ, ও। এগুলো সিলেটী নাগরীতে যথাক্রমে,

এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ২৭ টি, যথা- ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, র, ল, ড়, শ, হ।'[১৫০]

এগুলো সিলেটী নাগরীতে যথাক্রমে,

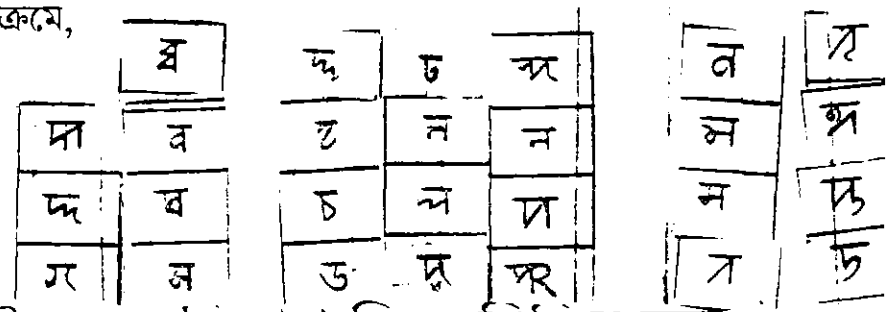

সিলেটী নাগরীর উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে বিভিন্ন মত

সিলেটী নাগরীর উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন রকম মন্তব্য করেছেন। তা নিম্নে উল্লেখ করে একটি সিদ্ধান্তে আসা আবশ্যক।

ড. আহমদ দানী সিলেটি নগরীর উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এভাবে, "কার্যকরণের সাধারণ যুক্তিতে তাহলে শ্রীহট্ট নাগরীর উৎপত্তিতে আমরা খ্রিষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এ অঞ্চলে আফগানদের উপনিবেশ স্থাপনের এবং মুদ্রায় এ লিপি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের সহজ প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত করে নিয়ে যেতে পারি । অন্য কোন সময়ে এ লিপির ব্যবহার হয়েছে বলে জানা যায় না, বা অন্য কোন পথে বা উপায়ে শ্রীহট্টে এই লিপি এসে পৌঁছেছে এ খবরও আমরা জানিনে । উপরন্তু এ পর্যন্ত এই লিপিতে লেখা যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার সবগুলোই এই সময়ের পরবর্তী এবং এর কোনটার মধ্যেই এ সময়ের পূর্বে লেখা কোন মূল পুথির নির্দেশ বা ইঙ্গিত নেই"।[১৫১]

ড. আহমদ দানী আরো বলেন, " প্রথম যুগের মুসলমান শাসনকর্তাদের মুদ্রায়– বিশেষ করে রূপো ও বিলন (Billon) মুদ্রায় আরবীর পাশাপাশি নাগরীলিপি অঙ্কিত হ'তো এবং তা হ'তো হিন্দু প্রজাদের সুবিধের জন্যে। কিংবা বড় জোর মৌদ্রিক ( ) প্রথাকে চালু রাখার জন্য। এটি বড়ই অর্থপূর্ণ যে, হিন্দুদের মধ্যে আরবীলিপি ব্যাপকভাবে পরিচিত তথা প্রচলিত হ'য়ে উঠবার পর সৈয়দ, লোদী প্রভৃতি পরবর্তী তোগলক এবং মোগলদের মুদ্রায়নাগরীলিপির অঙ্কন ছেড়ে দেওয়া হলো। এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম রইল সুরী-সুলতানেরা এবং বাংলায় তাদের উত্তরাধিকারী কররানীরা।"[১৫২]

সিলেটী নাগরী লিপির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী অভিমত প্রকাশ করেন, "হযরত শাহাজালালের আগমনের সময় সিলেট ছিল সাংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। নাগরী বর্ণমালাই ছিল সিলেটে ভাব প্রকাশের একমাত্র বাহন । হযরত শাহাজালালের সঙ্গীদের মধ্যে উত্তর ভারতের হিন্দী ভাষা-ভাষী পরবর্তীকালে আফগান

---

১৫০. ড. এস.এম. গোলাম কাদির। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

১৫১. উদ্ধৃত। ড. এস.এম. গোলাম কাদির। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।

১৫২. ড. আহমদ হাসান দানী। শ্রীহট্ট নাগরী লিপির বিকাশ, (বাংলা একাডেমী, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ঢাকা-১৩৬৪ বাং), পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

শাসন কর্তারা বায়েজিদ কররানী প্রমুখ ষোড়শ- সপ্তদশ শতকে সিলেটী নাগরী লিপি তাদের মুদ্রায় ব্যাবহার করেন , যেহেতু নাগরী লিপি ছিল সর্বজনবোধ্য" ।[১৫৩]

সিলেটী লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে Sir George Grierson তাঁর 'Linguistic Survey of India' গ্রন্থে বলেন–

"Among the low class Muhammedans to the east of this district (Sylhet) the use of Devenagari alphabet Oceurs. It is extremly Common for Muhammadans to sign their names in this character end the only explanation. The offer for its use is that it is so much easier to learn than Bengali. Punthis in Bengali are printed in this character, but except for this purpose and for the writings of signatures by otherwise iliterate men the script in hardly used, Never at least in formal documents."[১৫৪]

বাংলা অনুবাদঃ 'সিলেটের পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে দেবনাগরী লিপির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তাদের সাধারণ জীবনে স্বাক্ষর করতেও এ লিপি ব্যবহার করতো। কারণ এটা ছিল বাংলার চেয়ে ব্যবহারিক দিক থেকে সহজবোধ্য। বাংলায় কেচ্ছা ও কৌতুক ছাপানো ও স্বাক্ষর করা ব্যতীত অশিক্ষিত লোকেরা তা কদাচিৎ ব্যবহার করত। তবে অফিশিয়াল পত্রাদিতে তা কখনই ব্যবহার করা হতো না। '

সিলেটী লিপির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Origin and Development of Bengali Language' গ্রন্থে বলেন–

"In Sylhet a kind of modified Devnagari Called 'Silelt Nagari' has a restricted use among the local Mussalmans and this use of Nagari in distant East Bengal and among Mohamedans too in explained as being the result of the influence of early colonies of prosilything Moslems from upper India who wrote their vernaculars (Eastern and western, Hindi dialects) in Devanagari-Persinanised Hindi (or Urdu) being not yet in the field and taught it to the local converts; a tradition in employing this alphabet was thus established and was continued down to our times. Recently this alphabet has been used in printing."[১৫৫]

বাংলা অনুবাদ: সিলেটের দেবনাগরী এক ধরনের কিছুটা পরিবর্তিত রূপ সিলেটি নাগরী নামে পরিচিত। যা সিলেটে নিম্নস্তরের মুসলমানদের মধ্যে ছাড়াও পশ্চিম বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে । ঔপনিবেশিক যুগে আপার ইন্ডিয়ার যে সকল লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং যারা তাদের উপভাষা দেব নাগরী , ফার্সী ও

---

১৫৩. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী। পূর্বোক্ত, পৃ.২০-২১।

১৫৪. উদ্ধৃত। সৈয়দ মূর্তাজা আলী। সিলেটী নাগরী লিপি ও বাংলা সাহিত্য (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বর্ষ-১৩৬৮।)

১৫৫. উদ্ধৃত। সৈয়দ মূর্তাজা আলী। ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

উর্দুতে তখনও শুরু করেনি, তাদের কে এই লিপিতে শিক্ষা দেওয়া হতো । এই লিপি চর্চার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং তা আজও অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে । বর্তমানে এই লিপিতে বই ছাপা হচ্ছে।

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব তাঁর 'Social History Kamrupa' তে সিলেটী লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন– "Though converted to Muhammedan religion those who resided in Sylhet and its neighborhood and near Bishnapur (Bankura) retained to a certain extent the distinctive feature of their community. It is remarkable that the alphabets which they adapt while writing their books on subjects connected with Muhammedan religion is Nagari. Though the languages used in Bengali. This alphabet is as known Sylhet Nagari and Mussalamani Nagari. Mussalamani keehchas are printed Culcutta from types adopted from the characters of Sylhet Nagari. Fifty years ago Munshi Abdul Karim, an in habitant of Sylhet, returning from Europe, constructed the nagari types after having revised the alphabet on European model by rejecting many of its letters."[১৫৬]

বাংলা অনুবাদ:- সিলেটের এবং পার্শ্ববর্তী বিষ্ণপুর এলাকার যারা ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তারা তাদের সমাজের পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিল । এটা উল্লেখ করার মতো যে, তারা তাদের ইসলাম সম্পর্কে ধর্মীয় পুস্তকে নাগরী লিপি ব্যবহার করছিল ; যদিও সে গুলোর ভাষা ছিল বাংলা । এই লিপিই সিলেটি নাগরী এবং মুসলমানী নাগরী নামে পরিচিত। কলকাতা থেকে যে সকল মুসলমানী কেচছা প্রকাশ হতো , সেগুলো সিলেটি নাগরিতেই লিখিত হতো । ৫০ বছর আগে মুন্সি আব্দুল করিম নামে সিলেটের একজন অধিবাসী ইউরোপ থেকে ফিরে এসে নাগরির অনেক বর্ণগুলোকে বর্জন করে নাগরী বর্ণমালাকে ইউরোপীয় মডেলে প্রস্তুত করেন।

সিলেটী নাগরী লিপির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ 'India Historical Quarterly' তে বলেন–

"There is a script called Mussalmani Nagari in use amongst the Musalmans of Sylhet. It is on record that many Brahman families of sylhet embraced Islam. It is in contradistinction of Devnagari which Hindus used. It is for the expert to say if the Nagari and Mussalmani Nagari derived from a common script." [১৫৭]

---

১৫৬. উদ্ধৃত। সৈয়দ মূর্তাজা আলী। সিলেটী নাগরী লিপি ও বাংলা সাহিত্য (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বর্ষ-১৩৬৮।)
১৫৭. উদ্ধৃত। সৈয়দ মূর্তাজা আলী। ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অনুবাদ:- 'সিলেটের মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানী নাগরী নামে একধরনের লিপি রয়েছে । সিলেটের বহু ব্রাহ্মণ পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় । হিন্দুরা যে দেবনাগরী ব্যবহার করতো তার সঙ্গে এর বিপরীত গুণ দেখিয়ে প্রভেদ নির্ণয় করা হয় । এটা সন্দেহাতীত নয় যে, নাগরী এবং মুসলমানী নাগরী একই সাধারণ হরফ থেকে উৎপন্ন হয়েছে ।'

সিলেটী নাগরী লিপি সম্পর্কে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের লেখক শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি বলেন– " শ্রীহট্টের মুসলমানদের মধ্যে একরূপ নাগরাক্ষর প্রচলিত আছে। আনেক মুসলমানী কেতাব এই অক্ষরে মুদ্রিত হয়। এই ভাষা অতি সহজে শিক্ষা লাভ করা যায়।"[১৫৮]

'Sylhet District Gajetter' (১৯০৫) এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে–

"The Dev-nagari character is used amongst lowcaste Muhamedans especially in the east of the district. They find it easier to master than Bengali and Bengali books are printed in this character for that benefit (p. 74)." [১৫৯]

বাংলা অনুবাদ:- 'দেবনাগরী হরফ নিম্ন স্তরের মুসলমানদের মধ্যে ব্যবহৃত হতো , বিশেষ করে জেলার পূর্বাঞ্চলে । তারা দেখলো যে, এই লিপি বাংলা লিপির চেয়ে আয়ত্ত করা সহজ এবং বাংলা বইগুলো বাংলা লিপির চেয়ে এই লিপিতে ছাপানো সহজ।

সিলেটি নাগরী সম্বন্ধে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ১৩১৫ বঙ্গাব্দ ' সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়' একটি প্রবন্ধ লেখেন। তার মতে, "শাহজালালের সঙ্গে ৩৬০ জনে আওলি'য়া আইসেন । ইহাদের অধিকাংশ উত্তর প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন । তখনও বোধহয় আরবী অক্ষরে হিন্দী ভাষা লিখিত হইয়া উর্দূ ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। তাই এই সকল মুসলমান প্রধানতঃ হিন্দী ভাষারই চর্চা করিয়া দেব নাগরাক্ষরে লেখাপড়া করিতেন । তাহাদের অনুকরণে শ্রীহট্টের সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও নাগরাক্ষর শব্দ প্রসার হইল । কালক্রমে যদিও পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান সমাজে হিন্দী আরব্যাক্ষরে লিখিত হইয়া আরব্য-পারস্য শব্দবহুল হইয়া উর্দূতে পরিণত হইল এবং সেই উর্দু সমগ্র মুসলমানাধিকৃত ভারত বর্ষে প্রসারিত হইয়া পৌছিল তথাপি এই অঞ্চলের মুসলমানেরা নাগরাক্ষর একেবারে পরিত্যাগ করিল না। তবে নাগরাক্ষরের প্রসার অনেকটা খর্ব হইল। একদিকে স্থানীয় চলভাষা অন্যদিকে মুসলমানদের আরব্য পরস্য ও উর্দু ভাষা----- এই উভয় সঙ্কটে নাগরাক্ষর হীন প্রভ এবং শীর্ণ ও বিকৃত হইতে লাগিল । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছিল যে, নিম্নস্তরের মুসলমানদের মধ্যে যাহারা বাংলা অক্ষর জানিত না তাহারা পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রে মাত্র এই অক্ষর ব্যবহার করিত।"[১৬০]

১৫৮.শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, (প্রথম খণ্ড, কলকাতা-১৩১৭ বাং), পৃ. ৯৭-৯৮।

১৫৯. উদ্ধৃত। সৈয়দ মূর্তাজা আলী। সিলেটী নাগরী লিপি ও বাংলা সাহিত্য (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বর্ষ-১৩৬৮।)

১৬০. উদ্ধৃত। সৈয়দ মূর্তাজা আলী। ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটী নাগরী লিপি সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের মত হলো , (History of Bengali literature p. 118)

"The Muslim Settlement of Sylhet remained in more or less cultural isolation. They had never lost contacted with their west country co-religionist. They cultivated Hindi poetry and had kept lip the use of Kayathi script amongst themselves. In the last quarter of nineteenth century books were printed in this script which was known as Sylhet Nagari. The Muslims poets Sylhet preferred writing purely romantic narratives as well Vaisnava lyrics and Mystic songs."[161]

বাংলা অনুবাদঃ- 'সিলেটের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় কমবেশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় সম্পর্কের কারণে তারা পশ্চিমা দেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। কাইথী বর্ণমালার সাহায্যে তারা তাদের নিজেদের মধ্যে হিন্দি কবিতার চর্চা করেছে । ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ সময়ে (২৫বছরে) তারা তাদের বর্ণগুলো এই লিপিতে লিখেছে ; যা সিলেটি নাগরী নামে পরিচিত। সিলেটের মুসলিম কবিরা বৈষ্ণব এবং বাউল সঙ্গীতের মতো রোমান্টিক রচনা এই লিপিগুলোতেই লিখেছে ।'

সিলেটী নাগরী সম্পর্কে সুলতান আহম্মদ ভূঁইয়া তাঁর 'বিদেশী হরফে প্রাচীন গ্রন্থে' লিখেছেন, "তবে মুসলমান অভদ্র জনসাধারণের নিকট ধর্মশাস্ত্রমূলক সাহিত্য প্রচারের প্রেরণাই নাগরী অক্ষর প্রচলনের মূলে কার্য রহিয়াছে।"[১৬২]

সিলেটী লিপি সম্পর্কে আধুনিক মত

জনাব ড. এস এম গোলাম কাদির তার 'সিলেটী নাগরী লিপি ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে এ লিপি সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য অভিমত উপস্থাপন করেছেন, তা নিম্নরূপঃ

"১. এ লিপির প্রচলনকারী ছিলেন অবাঙ্গালী মুসলমান কিন্তু তারা স্থানীয় ভাষাভাষীদের সঙ্গে সহজে একাত্মতা পোষণের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন স্থানীয় ভাষায় নিজেদের নিজেদের আত্মপ্রকাশকে ত্বরান্বিত করার জন্যই কাইথী, বাংলা ,দেবনাগরী , আরবি লিপির মিশ্রণে এবং নিজেদের কিছু স্বকীয় উদ্ভাবনায় একটি সহজতর বর্ণমালা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।

---

১৬১. উদ্ধৃত। সৈয়দ মূর্তাজা আলী। সিলেটী নাগরী লিপি ও বাংলা সাহিত্য (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বর্ষ-১৩৬৮।)
১৬২. উদ্ধৃত। সৈয়দ মূর্তাজা আলী। ঐ।

Dhaka University Institutional Repository

২. উপরোক্ত চারটি বর্ণমালার সঙ্গেই তাঁদের মোটামুটি পরিচয় ঘটেছিল। কিন্তু তাঁদের মাতৃভাষায় কিংবা সমাজ জীবনে কোনটিরই ব্যাপক প্রচলন না থাকায় তাঁরা সংশ্লিষ্ট লিপিগুলোর জটিলতা পরিহার করে সহজে দেশীয় ভাষা প্রকাশ ও আত্মীয়করণের উপযোগী একটি অজটিল বর্ণমালার প্রচলন করেন। ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাষার আরবি ও ফারসি লিপি তাদের জানা ছিল বটে, কিন্তু সেমেটিক লিপিতে স্থানীয় বাংলা ভাষার প্রকাশ বিঘ্নিত হবে, সম্ভবতঃ এ সত্য তাদের অজানা ছিল না।

৩. প্রথমে আবিষ্কর্তাদের স্থানীয় ভাষা শিক্ষা ও ব্যবহারের কাজে এ লিপির ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে সহজ বিধায় জনগণের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। স্থানীয় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁরাও এ লিপির চর্চা শুরু করে। এভাবেই এ লিপির চর্চাকারী লোক জীবনের কাছাকাছি মানুষ ছিলেন। পরবর্তীকালেও এ লিপিতে রচিত সাহিত্যে লোকজনের প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়।

৪. ঐতিহাসিক বিবর্তনের অনিবার্যতায় ও সময়ের গতিতে স্থানীয়-অস্থানীয় ব্যবধান দূর হয়ে মিশ্রণ পূর্ণতা লাভ করে। তাছাড়া ইতোমধ্যে অতীতের আরবি, ফারসি চর্চার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে আসে। পক্ষান্তরে নবাগত আধুনিক ইংরেজী-বাংলার মাধ্যমে জীবনচর্চা ও তাঁদের সাধ-সাধ্যের বাইরে থেকে যায়। ফলে সিলেট অঞ্চলে সিলেটী নাগরীর প্রচলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু দস্তখত আর চিঠিপত্র লেখার মত নামমাত্র সাক্ষরতার কাজে নয়, ধর্ম-জীবন, সমাজ-সাহিত্য, গান-গীতিকা প্রভৃতি আনন্দ বেদনার প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে এ লিপিমালাটি ব্যবহৃত হতে থাকে।"[১৬৩]

সিলেটী নাগরী লিপির সাথে অন্যান্য লিপির বৈসাদৃশ্য

সিলেটী নগরীর লিপির সাথে অন্যান্য লিপির বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ের জন্য যে সকল সূত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে সেগুলো হলোঃ

ক. প্রচলিত সিলেটী নাগরী বর্ণমালা
খ. প্রচলিত বাংলা বর্ণমালা
গ. প্রচলিত কাইথী বর্ণমালা
ঘ. প্রচলিত দেবনাগরী বর্ণমালা
ঙ. প্রচলিত আরবী বর্ণমালা এবং
চ. আফগান মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি।

---

১৬৩. এস.এম. গোলাম কাদির। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত লিপিগুলোর সাহায্য নিয়ে নিম্নে তুলনামূলক লিপিচিত্র প্রদর্শিত হলোঃ

১৬৪. এস.এম. গোলাম কাদির। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০-৫১।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত তুলনামূলক লিপিচিত্রের প্রতি নজরে দিলে দেখা যায়, 'সিলেটী নাগরীর ড, ঢ, দ, ন এবং ড় - এই পাঁচটি হরফ বাঙলা লিপিমালার ঐ নামীয় হরফগুলার অনুকরণে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য 'দ' হরফের সঙ্গে আফগান মুদ্রায় দ এবং ন হরফের সঙ্গে আফগান মুদ্রায় 'দ' এবং 'ন' হরফের সাথে দেবনাগরীর ন- এর সদৃশ্য আছে। সিলেটী নাগরীর - গ, জ, ত, থ, ও প এই পাঁচটি হরফ দেব নগরী প্রভাবিত। তবে দেবনগরীর হরফ ও স্বরচিহ্নের প্রভাব সিলেটী নগরীতে সরাসরি না এসে পশ্চিমা হিন্দির বিভিন্ন লিপির মাধ্যমে আসার সম্ভাবনা বেশি। আবার দেবনাগরীর সদৃশ্য অনেকটা দূরের 'থ' হরফটি ঐ নামীয় কাইথী বর্ণ থেকে উদ্ভূত হবার সম্ভাবনাকেও একেবারে বাদ দেয়া যায়না।
বিভিন্ন কাইথী হরফের প্রভাবই সিলেটী নাগরীতে সর্বাধিক মনে হয়। সেগুলোরসংখ্যা ১২ টি, যথা - উ, এ, ও, চ, ট, ঠ, ফ, ব, ভ, ম, র এবং শ।'[১৬৫]

সিলেটী নাগরীর নিজস্ব উদ্ভাবিত হরফ সংখ্যা ৯ (নয়), সেগুলো হলোঃ- আ, ক, খ, ঘ, ছ, ঝ, ধ, ল এবং হ। আরবি হরফ আলিফ, উয়াও এর প্রভাবে সিলেটী নাগরী লিপি 'আ' 'ও' নির্ধারিত হয়েছে। এছাড়াও সিলেটী নাগরীর ক,খ,গ,ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, প,ফ,ব,ভ প্রভৃতি স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধবনির উচ্চারণে স্পষ্টত আরবী উচ্চারণের প্রভাব রয়েছে।

১৬৫. এস.এম. গোলাম কাদির। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

'সিলেটী নাগরী পহেলা কেতাব' নামে পঠন-পাঠন বিষয়ক একটি পুস্তিকা 'মাং আবুল হোসেন ও আং মুনসি' দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটির সংশোধক হিসাবে মহাম্মদ আবদুল লতিফের নাম ছাপা হয়েছে। পুস্তিকাটির দিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দেওয়া হলো এবং তার আধুনিক বাংলা পাঠ দেওয়া হলোঃ-

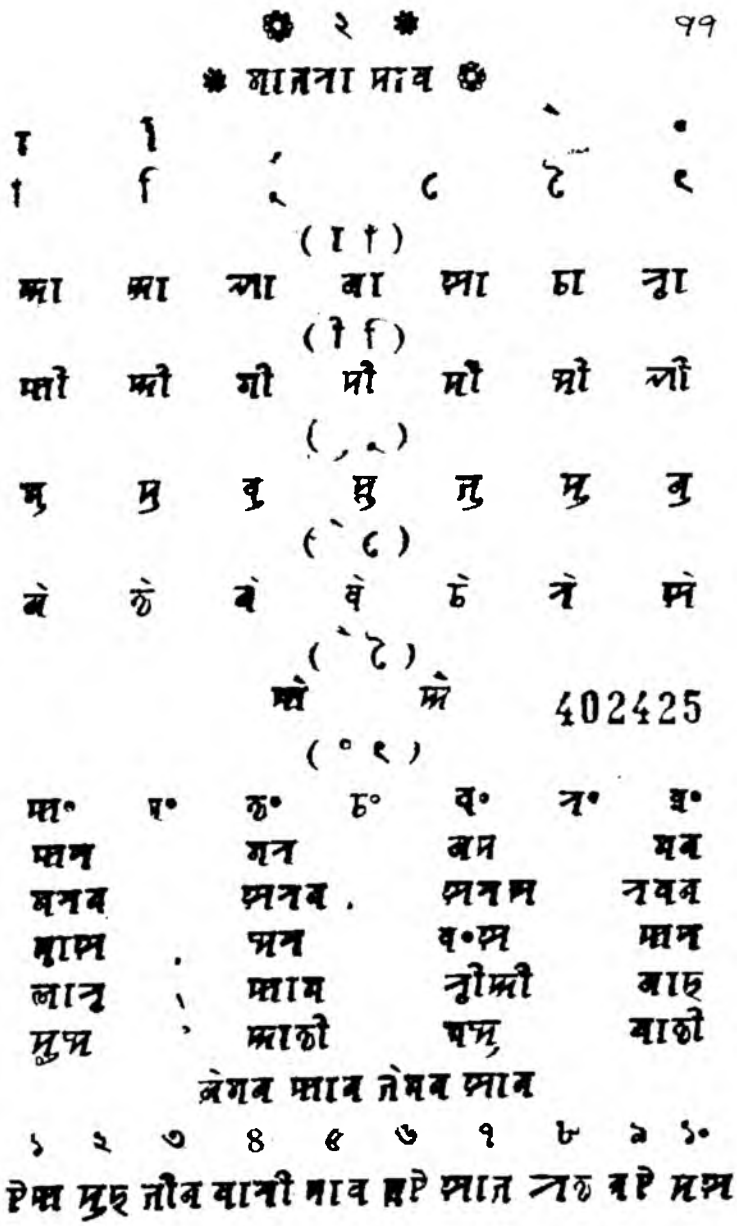

১৬৬. এস.এম. গোলাম কাদির। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

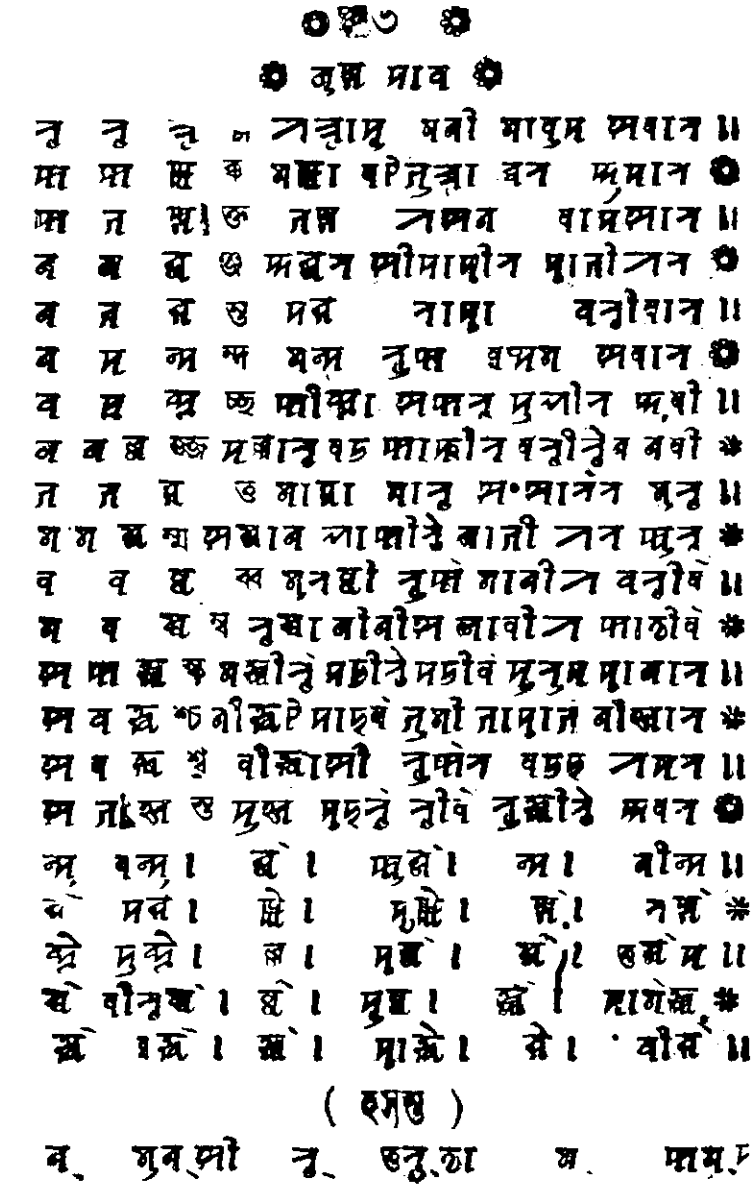

১৬৭. এস.এম. গোলাম কাদির। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

(া া)
কা খা থা জা শা চা লা
(ী ি)
কি খি গি পি দি ধি থি
(...ু)
মু দু বু ছু তু পু জু
(...ৈ)
কৈ খৈ
(০ ং)
"কং গং টং ঠং চং রং ওং
কর মর জপ মন
মরন শরন শরশ চরন
হাশ ধর বংশ কর
ভাল কাম লিখি জাই
দুধ খাটি মধূ চাটি
জেমন কাম তেমন শান
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ"[১৫৯]

৩
"* জুক্ত পাচ *
ল ল ল্ল আল্লাগনি মবিুদ শবার ॥
ক ক ক্ক মক্কা বায়তুল্লা ঘর খুদার ০
ক ত ক্ত তক্ত আশন বাদশার ॥
ন জ ঞ্জ (ঞ্জ) খঞ্জর শিপাহির হাতি আর ০
ন ত ন্ত রাহা চলি বার ॥
ন দ ন্দ মন্দ লুক ওধম শবার ০
চ ছ চ্ছ কিচ্ছা শকল পুথির খুবি ॥
জ জ জ্জ দজ্জাল বড় কাফির বলিলেন নবি ০
ত ত ত্ত মাত্তা মাল শাংশারের মুল ॥
ম ম ম্ম শম্মান থাকিলেন জাতি আর কুল
ব ব ব্ব মুরব্বি লুকে মানিআ চলিবে ॥ " [১৬৮]

---

১৬৮. এস.এম. গোলাম কাদির। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

"ম ব ম্ব লম্বা জিনিশ ভাবিআ কাটিবে ০
শ ক স্ক ( ) মি লে পড়িলে পড়িবে দুরুদ হাজার॥
শ চ শ্চ নিশ্চত্র পাইবে তুমি তাহাতে নি র
শ ব শ্ব বিশ্বাশি লুকের বড়ই আদর॥
শ ত স্ত ( ) দু হইলে লিবে মি লে খবর ০
ন্দু বন্দু । কুঞ্জে । ন্দ নিন্দ ॥
ন্ত পন্তা ক্কে হক্কে । ক্তে রক্তে ০
চ্ছে পুচ্ছে । জ্জে হজ্জে । ম্মে উম্মেদ ॥
ম্বে বিলম্ব । ব্ব হুবেব । দামে ০
শ্বে ও শ্বে । শ্চে হাশ্চে । ন্তে চিন্তে॥
(হসন্ত)
ন্ মুনশি ল্ উলটা ম্ কম্প"[১৬৯]

---

১৬৯. এস.এম. গোলাম কাদির । পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০ ।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটী নাগরী লিপিতে লিখিত গ্রন্থ

সিলেটী নাগরী লিপিতে লিখিত অনেক গ্রন্থ লিখিত হয়। এ লিপিতে রচিত সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, সেগুলো হলো–

(ক) রোমান্টিক আখ্যায়িকা
(খ) জীবনী ও যুদ্ধ কাব্য
(গ) সঙ্গীত মারফতি-মুর্শিদা, বৈষ্ণব-বাউল
(ঘ) সুফীতত্ত্ব বিষয়ক কাব্য
(ঙ) শাস্ত্রগ্রন্থ বা, ধর্মবিষয়ক রচনা এবং
(চ) বিবিধ বিষয়ক রচনা।

এ লিপির কয়েকজন খ্যাতিমান লেখক হলেন– সাদেক আলী, ভবানন্দ, মুন্সী ইরফান আলী, শাহনূর, মুনির উদ্দিন, শীতলাং শাহ্ প্রমুখ।

উপর্যুক্ত লেখকগণ সিলেটী নাগরীতে তাঁদের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। নিম্নে তাঁদেও কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচিতি ও সিলেটী নাগরীতে তাঁদের লিখিত গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সিলেটী নাগরী লিপির অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক জনাব সাদেক আলীর জীবন ছিল রহস্য ঘেরা। তিনি ১২০৮ সালে সিলেট জেলার লংলা পরগণার দৌলতপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। সাদেক আলী উচ্চ শিক্ষিত ও আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

'মানুষ মরিলে তাহার প্রাণ কোথায় যায়? এই প্রশ্নের উত্তর ও আত্মার মুক্তির রহস্য উদঘাটনের জন্য তিনি যৌবনকাল থেকে ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। দীর্ঘ কাল ধর্মালোচনার পর তিনি স্বধর্ম সনাতন ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল গৌর কিশোর সেন।

তাঁর রচিত নাগরী লিপিতে নাগরী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য পুস্তকের মধ্যে 'হালতুন্নবী' (হযরত মুহাম্মদদের জীবনী), 'মহব্বতনামা' (ইউসুফ- জোলায়খার প্রেম কাহিনী), 'হাশর মিছিল' (শেষ বিচারদিন ও পরলোক তত্ত্ব), 'রদ্দেকুফর' (হিন্দুধর্ম ও ইসলামের তুলনামূলক সমালোচনা),' আত্মজীবনী ও সমাজচিত্র' সুপরিচিত।

সাদেক আলীর হালতুন্নবীর (বাংলা-১২৬২) "কাব্যটিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত কর্মময় জীবনের অনুসরণ আছে, আর তার সঙ্গে আছে সৃষ্টিতত্ত্বে মুল

Dhaka University Institutional Repository

কথা। হযরতের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী এবং জীবনাশ্রয়ী আধ্যাত্মিক চিন্তার অবাধ বিস্তার।"[১৭০]

এ গ্রন্থ রচনার পেছনে লেখকের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলে জানা যায়, তা হলো রচনার ভেতর রচয়িতার বেঁচে থাকার ইচ্ছা । নবী করিমের জীবন কাহিনী প্রচার করে সাধারণ পাঠক শ্রোতাদের উপকার করা।
এ সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন,

" অধম ছাদেকে কহে ইরাদা আমার ॥
সকল মুমিনে পড়ি দু'আ করিবার-----
আমি জাইমু কথা রইব পড়িয়া মুমিন ॥
আমারে করিবা দু'আ থাকে যত দিন
হালতুন্নবী মুহনী কিতাবের নাম ॥
লেখি দিমু নবীজির বএআন তামাম
পড়িলে ইমান তাজা বড় ইবাদত ॥
শুনিআ নবীর মনে বাড়িব মহব্বত।"[১৭১]

রচনার মূল উৎস সম্পর্কে আরবী ফারসী গ্রন্থ, কোরান শরীফের তফসির হাদিস ও নবী করিমের জীবনীমুলক কেতাব, মৌলুদ শরীফ আর কাছাছেল আম্বিয়ার মতো কেতাবের কথা উল্লেখ করেছেন। কবি তাঁর কাবিতায়

" মৌলুদ শরীফ আর শিমাত্রল তিরমিজি ॥
ও হিউল কুলুব আর নবওত মারিজি
জামাউল উসুফ আর তফছির অআজিজি আ ॥
হেকাত্রত ঈমান আর কাছাছুল আম্বিয়া ।"[১৭২]

সাদেক আলীর 'মোহাব্বত নামা' পবিত্র কোরান ও বাইবেলে উল্লেখিত মিশরের জোলেখা ও কেনানের ইয়াকুব নবীর পুত্র হজরত ইউসুফের বিশ্ববিখ্যাত ঘটনা সম্পর্কিত একখানা প্রণয়োপাখ্যান।

---

১৭০. এস.এম. গোলাম কাদির। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১।
১৭১. এস.এম. গোলাম কাদির। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১।
১৭২. এস.এম. গোলাম কাদির। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইরানী কবি ফেরদৌসী ও জামীর অনুসরণে বাঙালী কবিরা 'ইউসুফ-জুলেখা ' কাব্য রচনা করেন। কবি সাদেক আলী ইরানী কবি জামীকেই অনুসরণ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন,

"মৌলানা জামির কালাম সমাচার ॥
মহব্বত নামা কিতাব ফারসীতে জার
ইউসুফ-জুলেখার কথা বেশুমার
বাংগেলা করিলু মুকে বুঝিবার "[১৭৩]

সিলেটী নাগরী সাহিত্যেও জনপ্রিয় লেখক জনাব শাহনুর, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হবিগঞ্জ জেলায় (সে সময়ের মহকুমা) জালালহাফ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ নমু। শাহনুর জন্মকবি ছিলেন। নাগরী লিপিতে তিনি অনেক গান রচনা করেন। সে গুলো নুর নছিয়ত নামে পরিচিত । তাঁর একটি গান নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

" বন্ধু প্রেমের পিয়াসী রে
বন্ধু তোর সনে পিরিতী করি
ঘরে না মুই রইতে পারি
বন্ধুরে দিবা-নিশী বুঝিয়া মরি তুই বন্ধুর লাগিয়া
রাইতে দিনে চাহিয়া থাকি পান্থ নিরখিয়া।
বন্ধুরে সহিতে না পারি দুঃখ সদায় জ্বলে হিয়া
স্বপনে দেখি বন্ধু না পাই জাগিয়া
বন্ধুরে সৈয়দ শাহনুরে কয় উদাসিনী হৈয়া
কি দোষে পরানের বন্ধু না চাও ফিরিয়া।"[১৭৪]

অর্থাৎ বন্ধু যখন ফিরে না চায়, প্রেমিকের ভলিবাসা না কমে বরং শত গুণ বৃদ্ধি পায়। প্রেমিকের প্রতিদান না পেয়ে প্রেমিক আত্মবিস্মৃত হয়ে অবশেষে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে, তার প্রেমের পরিমাণ আরো বেড়েই চলে।

সিলেটি নাগরী সাহিত্যের আর একজন জনপ্রিয় লেখক মুনির উদ্দিন। তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ পাওয়া যায় নাই। তবে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি মৌলভীবাজার জেলার সাবডিভিশনে নোয়াখালী গ্রামে জন্মগ্রহন করেন।তাঁর লিখিত রচনা 'দুই খুরা রাগ' নামে পরিচিত। সিলেটি নগরীতে তাঁর লেখা একটি গান উদ্ধৃত হলো।

"আমি মিছা কলঙ্কিনী সংসারে
সখীরে, পরান বন্ধু ছাড়িয়া গেল আমারে ।
বৃন্দাবনের মধুপুরে হয় গো রসের খেলা
তাহে হায় মদন জ্বালা হায় হায় হায়।

---

১৭৩. এস.এম. গোলাম কাদির। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯।
১৭৪. উদ্ধৃত। সৈয়দ মূর্তাজা আলী। শ্রীহট্টের ইতিহাস (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র-১৩৬৮), পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

ওগো শুকনা কমল শুকাইয়া গেল, পায়না মধু ভ্রমরায়
মধুপুরে গেলা হরি না আসিলা আর
হইল গোকুল অন্ধকার হায় হায় হায়।
ওগো করনে সুখচারিনী ঘরে ভ্রমর নিবলে
দৈ-খুরা পাগলে কয়, আল্লার নামে সার
মিছা ভবেরবাজার হায় হায় হায়।
কি জবাব দিবায় মনা কবর-হাশরে"[১৭৫]

সিলেটি নাগরী সাহিত্যের একজন আধ্যাত্মিক সাধক জনাব শীতলাং শাহ। তিনি ১২০৭ সালে করিমগঞ্জ সাব-ডিভিশনের শ্রী গৌরীগ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সাংসলীম এবং মুন্সি জাহা বখ্স বলে জানা যায়। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় অগ্রসর হয়ে সীতালং শাহ অর্থাৎ পায়ের গোড়ালী শাহ (সীতালং শাহ শব্দের অর্থ পায়ের গোড়ালি) এই বিনয় সূচক নাম গ্রহন করেন। তাঁর রচিত গান সীতালংগী রাগ নামে পরিচিত। নিম্নে তাঁর রচিত একটি গানের নমুনা দেওয়া হলো ঃ

"প্রথম পীরিতে মজা, দ্বিতীয় পীরিতে সাজা
তৃতীয় পীরিতে রাজা, রংখুসী বেসুমাল
শীতালং ফকিরে বলে, প্রেম মালা যায় গলে
(ওগো) কেউ কারে কথা নাহি শুনে
কেবল বন্ধুয়া বন্ধুয়া সার"[১৭৬]

১৭৫. উদ্ধৃত। সৈয়দ মূর্তাজা আলী। শ্রীহট্টের ইতিহাস (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র-১৩৬৮), পৃ. ১১০।
১৭৬. উদ্ধৃত। সৈয়দ মূর্তাজা আলী। ঐ । পৃ. ১১০।

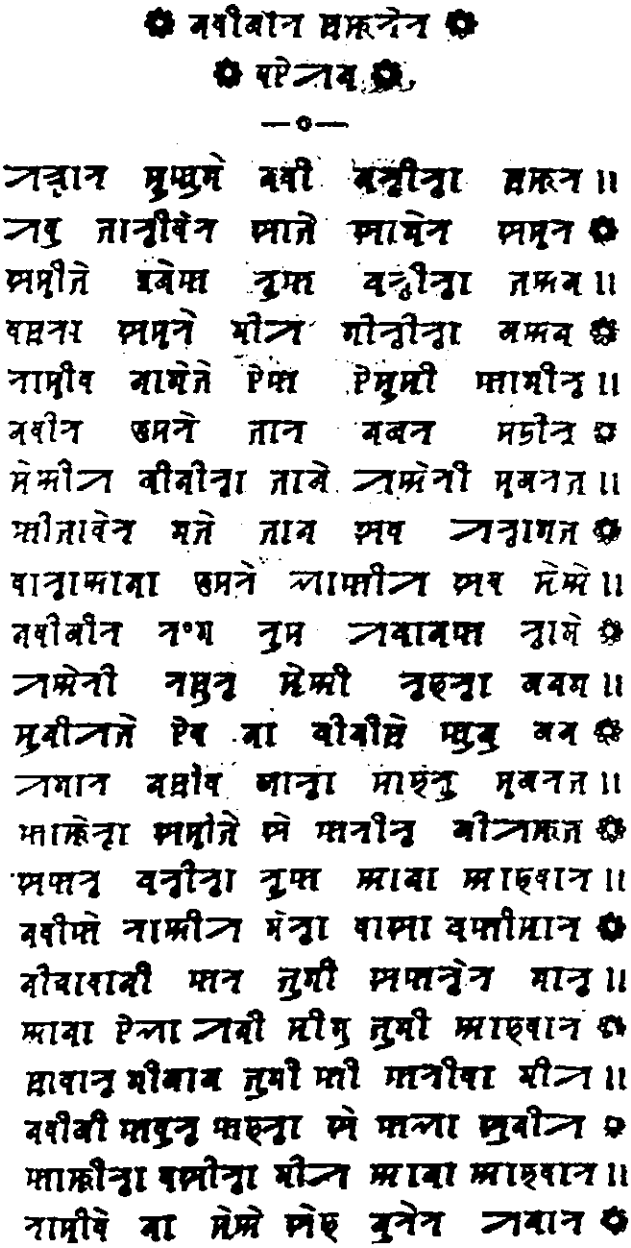

Dhaka University Institutional Repository

সিলেটি নাগরী লিপিতে লিখিত ধর্মীয় কাহিনীর একটি পৃষ্ঠার নমুনা ও তার পাঠ দেওয়া হলোঃ

১৭৭. এস.এম. গোলাম কাদির। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

নবিজির ছফরের
বএআন
আল্লার হুকুমে নবি চলিল ছফর
আবু তালিবের শাথে শামের শহর*
শহিতে অনেক লুক চলিলা তখন ॥
বছরা শহরে গিআ মিলিলা জখন*
বাহিব নামেতে এক এহুদী কামিল ॥
নবির উপরে তার নজর পড়িল*
দেখিআ চিনিলা তারে আখেরি হজরত ॥
কিতাবের মতে তার সব আলামত*
বালাখানা উপরে থাকিআ শব দেখে॥
নবিজির রং রূপ আচানক লাগে*
আখেরি রছুল দেখি লইলা জনম॥
দুনিয়াতে এব না চিনিছে কুনু জন*
আমার নছিব ভালা পাইলু হজরত ॥
কাফেলা শহিতে শে করিল জিআফত*
শকল চলিলালুক খানা খাইবার॥
নবিকে রাখিআ গেলা বাশা চকিদার*
নিঘাবানি কর তুমি শকলের মাল॥
খানা এথা আনি দিমু তুমি খাইবার*
ছাবাল মেজাজ তুমি কি করিবা গিআ॥
নবিজি কবুল কইলা শে কথা শুনিআ*
কাফিরা বশিলা গিআ খানা খাইবার॥
বাহিবে না দেখে শেই নুরের আচার*"[১৭৮]

১৭৮. এস.এম. গোলাম কাদির। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পূর্বোক্ত আলোচনায় বাংলাদেশ ও বাংলা লিপি নিয়ে বিভিন্ন বিদ্বান ব্যক্তির অভিমত পাওয়া গেছে। তাঁদের অভিমত শেষে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলা দেশের মত বাংলা লিপিও প্রাচীন। বাংলালিপি সম্পর্কে সাম্প্রতিক অভিমতও বাংলা লিপির আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে- সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিভিন্ন শিলালেখে প্রাপ্ত বাংলা লিপির পাঠোদ্ধার করা ছাড়াও, প্রাপ্ত লিপিপত্রের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। পাল, সেন ও মুসলিম আমলের প্রাপ্ত শিলালিপি হরফ ও বিষয়ের বৈচিত্র্য আনয়ন করেছে। এ সকল কারণে শিলালেখে প্রাপ্ত বাংলালিপির আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন বলে পরিচিত চর্যাপদের লিপিবিচার ও বৈচিত্র্য নির্দেশ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৪০১-১৮০১ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপির লিপিবিচার, পাণ্ডুলিপির বিশেষ পৃষ্ঠার পাঠোদ্ধার ছাড়াও, লিপিবৈচিত্র্য নির্দেশ করা হয়েছে।

মুসলিম শাসন আমলে মাত্র আঠারো হরফের সাহায্যে বাংলা লেখার চেষ্টা ও সাফল্য, এ আমলের বিস্ময়কর সাফল্যকে সূচিত করে। তাছাড়াও আরবী লিপির সাহায্যে বাংলা লেখার চেষ্টা এবং এ চেষ্টার সাফল্য মুসলিম গবেষক ও পণ্ডিতদের ঐকান্তিক পরিশ্রম ও একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। এর ফলে বাংলা ভাষার গ্রহণযোগ্য ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এ ভাষা আরো সমৃদ্ধ হয়েছে।

ভাওয়ালের চণ্ডাল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভাওয়াল লিপির প্রচলন ছিল তা জানা যায় এবং এ সম্পর্কে গবেষণা করলে বাংলা সাহিত্যের আরো অনেক বিষয় জানা যাবে, তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এছাড়া সিলেটী নাগরীর উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে বিভিন্ন বিদ্বান ব্যক্তির মূল্যবান অভিমত পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, এ লিপিতে লিখিত মানবিক সাহিত্যের বিকাশ হয়েছিল তারও পরিচয় পাওয়া যায়। এ লিপি চর্চাকারী বেশ কয়জন কবি সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মও আলোচনা করেছে। পরিশেষে এ অভিসন্দর্ভের সাথে সঙ্গতি রেখে কিছু লিপিবৈচিত্র্যের সংযোজন করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

PLATE VI.

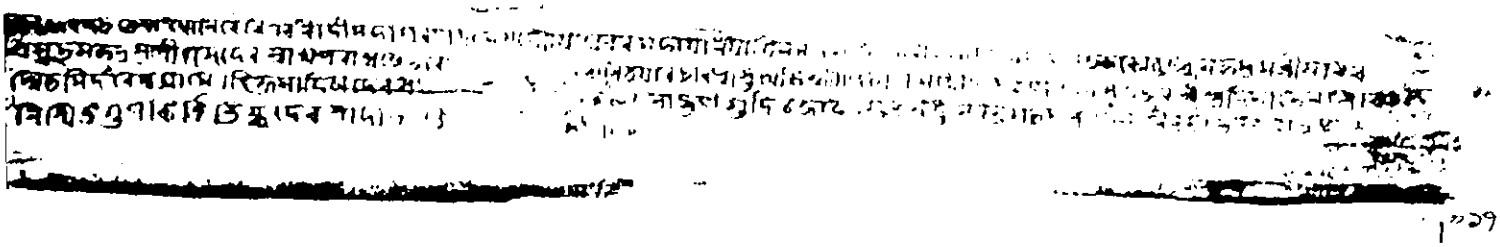

Bodhicaryavatara (Ms. Ga 8067) Fol 65, Rev. (A. S. B.)

PLATE V.

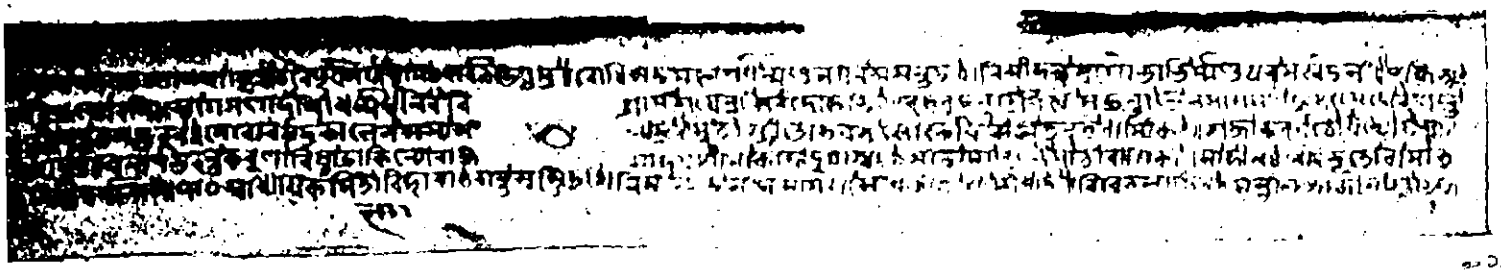

Bodhicaryavatara (Ms. Ga 8067) Fol. 65. obv, A. S. B.

১৭৯. R.D. Banerji. পূর্বোক্ত।
১৮০। R.D. Banerji. পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

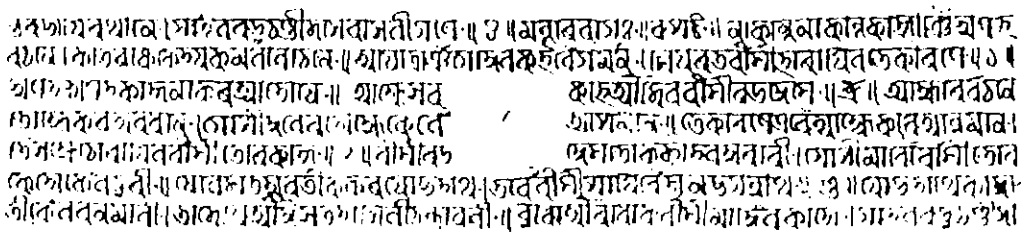

Krsnakirttana (Ms Bangiya Sahitya Parishad) Fol. 179. Rev.

১৮১. R.D. Banerji. পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

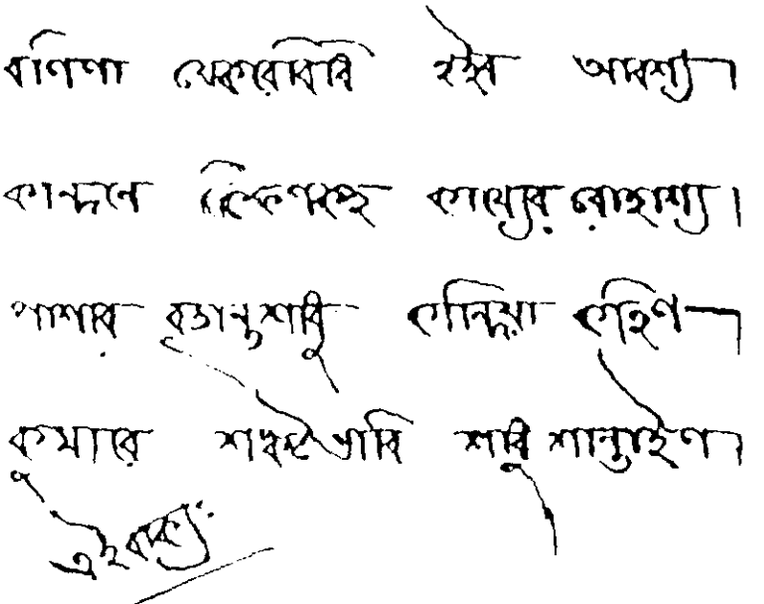

পৃষ্ঠার শেষে লেখা রয়েছে 'এই বাক্য'। পরবর্তী পাতার ১ম পৃষ্ঠা শুরু হয়েছে 'এই বাক্য' দিয়ে ঃ

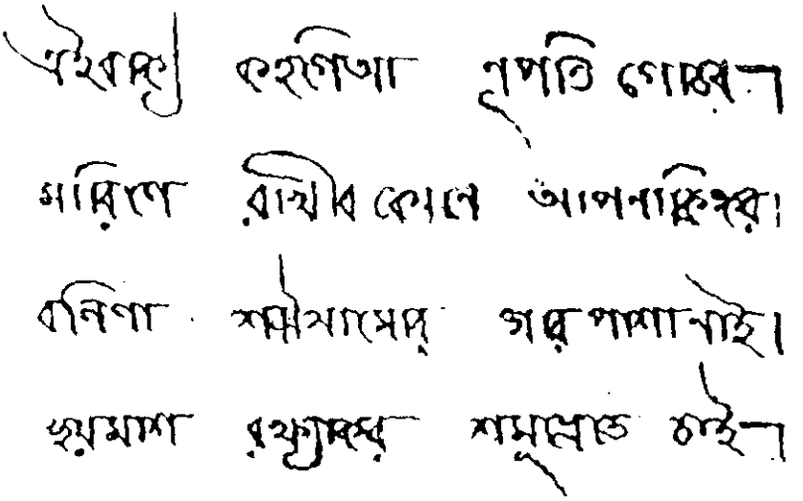

১৮২. ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

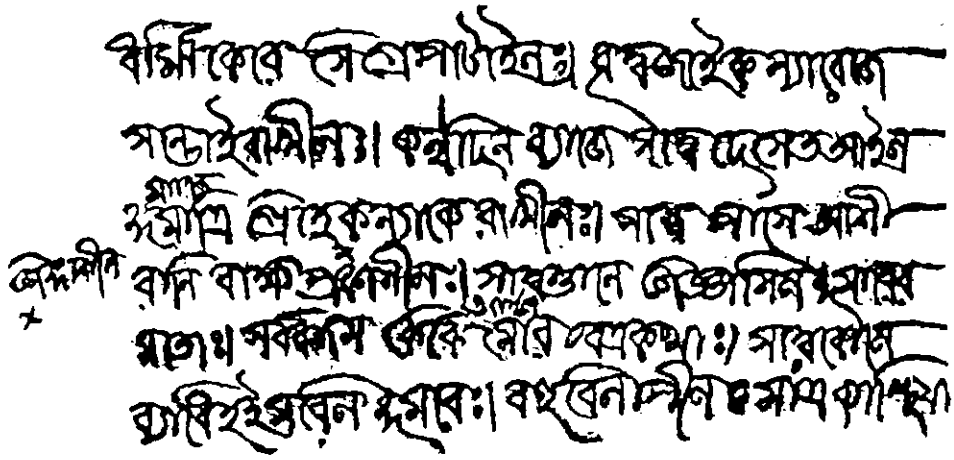

১৮৩. ড.মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পূর্বোক্ত পৃ. ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া কর্তৃক সংগৃহীত 'পদ্মাপুরাণ'-এর লিপিচিত্র, যা ১৮০৫ সালে অনুলিপিকৃত বলে জানা যায়।

---

১৮৪. ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া। বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা, পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

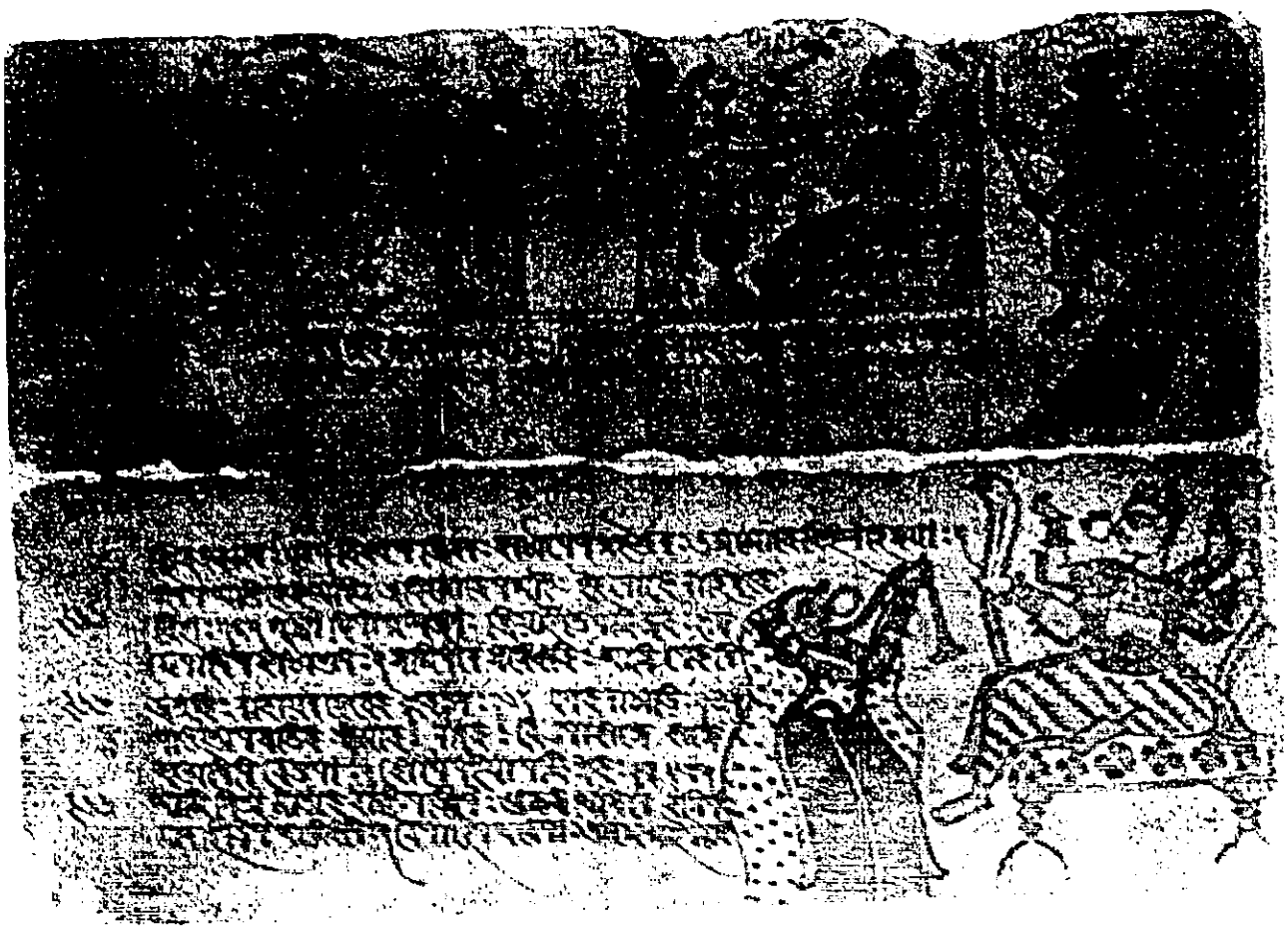

ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া কর্তৃক সংগৃহীত 'পদ্মাপুরাণ'-এর লিপিচিত্র, যা ১৮০৫ সালে অনুলিপিকৃত বলে জানা যায়।

---

১৮৫. ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া। বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা, পৃ. ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ঢাকা-১৯৬৫ ।
২. ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় –১৯৬২।
৩. নীহাররঞ্জন রায় । বাঙ্গালীর ইতিহাস , কলকাতা -১৯৮০।
৪.ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা, ঢাকা -২০০০।
৫. ড.এস. এম. লুৎফর রহমান । বৌদ্ধ চর্যাপদ, ঢাকা -১৯৯০।
৬. ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া। পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা , ঢাকা -১৯৮৪।
৭. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য, ঢাকা-১৯৬৪।
৮.সৌমেন্দ্রনাথ সরকার। চর্যাগীতি কোষ , কলকাতা- ১৯৭৮।
৯.নীলরতন সেন । চর্যাগীতি ছন্দ পরিচয়, কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৭৪।
১০.নীলরতন সেন। চর্যাগীতি কোষ কলকাতা-১৯৭৮।
১১. সুকুমার সেন। চর্যাগীতি পদাবলী , কলকাতা- ১৯৯৫।
১২. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত । আদ্য পরিচয়(শেখ জাহিদ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৭৯।
১৩. কল্পনা ভৌমিক। পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা, ঢাকা -১৯৯২।
১৪.রমেশচন্দ্র মজুমদার। বাংলাদেশের ইতিহাস , ১ম খণ্ড , কলকাতা-১৯৬১ ।
১৫. যতীন্দ্রমোহন রায় ।ঢাকার ইতিহাস , কলকাতা-২০০০।
১৬. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকা-১৯৭৭।
১৭. ড. এস .এম . লুৎফর রহমান । বাঙালা লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস, (বাংলা একাডেমী থেকে শীঘ্রই প্রকাশিতব্য)।
১৮. ড. এস .এম . লুৎফর রহমান। বাঙালীর লিপি-ভাষা, বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), ঢাকা-২০০৪।
১৯. ড. এস .এম . লুৎফর রহমান। বাঙালীর লিপি-ভাষা, বানান ও জাতির ব্যতিক্রমী ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), ঢাকা-২০০৪।
২০. ড. রামেশ্বর শ। সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, কলকাতা-১৯৮৪।
২১.ড. দীনেশ চন্দ্র সেন । বৃহৎ বঙ্গ (১ম খণ্ড), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ।
২২. মুহম্মদ আবদুল হাই। ধবনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধবনিতত্ত্ব, ঢাকা- ১৯৭৫।
২৩. এ.এ এম . আবদুল জলিল । পাঁচ হাজার বছরের বাঙলা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ, খুলনা- ১৯৭৫।
২৪. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী । সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভুমিকা , ঢাকা -১৯৬১।
২৫. গৌরীশঙ্কর হীরা চাঁদ ওঝা । অনুবাদ ও সম্পাদনায় মণীন্দ্রনাথ সমাজদার । "প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা" ঢাকা -১৯৮৯।
২৬. মুহম্মদ আবদুল আউয়াল । বাংলা ভাষার ইতিহাস , ঢাকা-১৯৭৫।
২৭. অমল দাশগুপ্ত । মানুষের ঠিকানা ,ঢাকা- ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. চৌধুরী আনিসুল হক । বাংলার মূল , ঢাকা- ১৯৯৫ ।
২৯. আবদুল করিম ।আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ , জীবন ও কর্ম , ঢাকা- ১৯৯৪ ।
৩০. এস. এম. গোলাম কাদির । সিলেটী নাগরী লিপি ভাষা ও সাহিত্য , ঢাকা -১৯৯৯ ।
৩১.তারাপদ মুখোপাধ্যায় । শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কলকাতা- ১৯৭৮ ।
৩২.শ্রী সুকুমার সেন । বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা-১৯৭৮ ।
৩৩. শেখ চাঁদ রচিত । তালিবনামা, বাংলা একাডেমী পাণ্ডুলিপি থেকে প্রাপ্ত ।
৩৪. বালক ফকির রচিত । আজির চৌতিশা, বাংলা একাডেমী পাণ্ডুলিপি থেকে প্রাপ্ত ।
৩৫.শ্রী মনোমোহন দাস । শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (পাণ্ডুলিপি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি, কল নম্বর -২৯৫৯৯ ।
৩৬. শ্রী নরোত্তম দাস । শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (পাণ্ডুলিপি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি, কল নম্বর -২৯১৭৬ ।
৩৭. দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা । বর্ণমালার উদ্ভব ও লিপি সভ্যতার ইাতহাস, ঢাকা -২০০৩ ।
৩৮ . শ্রী মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ । আদ্য -পরিচয় (শেখ জাহিদ) , রাজশাহী-১৯৬৪ ।
৩৯.ড. এম. এ.রহিম । অনুবাদ -মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান । বাংলার সামাজিক ওসাংস্কৃতিক ইতিহাস, ঢাকা-১৯৮২ ।
৪০.রাম শরণ শর্মা । ভাষান্তর ঃ সুমন্তর চট্টোপাধ্যায় । প্রাচীন ভারত, কলকাতা-১৯৭৫ ।
৪১.শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী । শ্রীহট্টের ইতিহাস, কলকাতা-১৩৬৪ ।
৪২.রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । বাঙ্গালার ইতিহাস , কলকাতা-১৩২৪ ।
৪৩. সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত । পদ্মাবতী, ঢাকা-১৩৬৮ ।
৪৪. ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ।বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড), ঢাকা -১৩৭১ ।
৪৫. ড. মুহম্মদ এনামুল হক । মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা-১৯৬৮ ।
৪৬. ড. আহমদ শরীফ । বাঙালী ও ড়াঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড), ঢাকা -১৯৮৩ ।
৪৭. ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার । শিলালেখ- তাম্রশাখানাদির প্রসঙ্গ, কলকাতা- ১৯৮২ ।
৪৮. নাজির হোসেন । কিংবদন্তির ঢাকা, ঢাকা- ১৯৯৫ ।
৪৯. ড. মুহম্মদ শাজাহান মিয়া । অনির্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দ, ঢাকা- ১৯৯৯ ।
৫০. ড. মুহম্মদ শাজাহান মিয়া সম্পাদিত । তৌহিদ ঈমান , ঢাকা ১৯৯৯ ।
৫১. R.D.Banerji. The Origin of the Bengali Script, Calcutta-1973.
৫২. Syed Sajjad Hossain. A Descriptive Catalouge of Bengali Manauscripts in Munshi Abdul Karim's Collections. By Munshi Abdul Karim's & Ahamed Sharif, Dhaka-1960.
৫৩. Nani Gopal Majumder. Inscription of Bengal,Vol. III, Rajshahi-1929.
৫৪. Sudhir Ranjan Das. Archacological Discoveries form Murshidabad, Calcatta-1971.

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. Bendall ceeil. Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manauscripts in the University library Cambrige, at the University Press (1883)

৫৬. Shamsad-Din-Ahmed. Inscription of Bengal, Vol. IV, Rajshahi-1960.

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

১. ড. আহমদ হাসান দানী । সিলেটি নাগরী লিপির উৎপত্তি ও বিকাশ , বাংলা একাডেমী পত্রিকা , ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ।

২. সৈয়দ মূর্তাজা আলী। শ্রীহট্টের ইতিহাস , বাংলা একাডেমী পত্রিকা , মাঘ-চৈত্র-১৩৬৮ ।

৩ সৈয়দ মূর্তাজা আলী। সিলেটি নাগরী লিপি ও বাংলা সাহিত্য , বাংলা একাডেমী পত্রিকা , ১৩৬৮ ।

৪. ড. এস এম . লুৎফর রহমান । ব্রিটিশ পূর্ব আমলে বাঙালা ভাষায় গবেষণায় বিস্ময়কর মুসলিম অবদান ঃ আঠারো হরফে বাঙালা লেখন, দৈনিক ইনকিলাব , ১লা বৈশাখ ,- ১৪০৮ ।

৫. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া । বাংলা হরফ : অনুস্বার; বিবর্তনের ধারায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা -১৯৮১ ।

৬. কল্পনা ভৌমিক । শ্রী কৃষ্ণকীর্তন পুথি ও পনের শতকের অপর একটি পুথি : একটি লিপিতাত্ত্বিক পর্যালোচনা । বাংলা একাডেমী পত্রিকা-১৩৯২ ।

৭. দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্ট।। এই শতকেই ৬৮০০ ভাষা বিলুপ্তি হইবে। ৬ই আষাঢ়, ১৪০৮ ।

৮.মোহাম্মদ ফেরদাউস খান ॥ হরফ সমস্যা(প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা) বাংলা একাডেমী পত্রিকা , ঢাকা-১৩৯২ ।

৯. ড. এস. এম. লুৎফর রহমান । বাঙালা ভাষায় আরবী-ফারছী-উরদু শব্দের সংস্কৃতায়ন ও তার পরিণাম (৪৫ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-২০০২ ।